বৈশাখী সংখ্যা ১৪২৯

বই বুটির কলকাতা

ভূমিকা

বাঙালী ও বাঙালিয়ানা উদযাপনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণ হল পয়লা বৈশাখ। নববর্ষে 'বই কুটির কলকাতা'র *বৈশাখী সংখ্যা ১৪২৯*। ইংরেজি ২০২০ সালে ১৫ আগস্ট আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল, যা সীমিত ছিল শুধুমাত্র ফেসবুকে। দিন ও সময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহীরুহের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। মহামারী কবলিত সময়ে দুর্দশাগ্রস্ত ও হতাশাময় জীবনে নতুন ছন্দ যোগ করতে আমাদের এই "***বই কুটির কলকাতা***" -র উদ্ভব। আপনাদের সহযোগিতা ও ভালোবাসায় আজ আমরা সমর্থ হয়েছি গত ছয় মাসে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ করতে। যা আপনারা খুব সহজেই বিনামূল্যে পেয়ে যেতে পারেন আমাদের '***বই কুটির কলকাতা***' র ওয়েবসাইটে।

আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল পাঠক ও লেখক-লেখিকাদের মধ্যে এক নির্মল যোগসূত্র তৈরি করা, আশা করি এই লক্ষ্যে আজ আমরা সফল। শুধুমাত্র বর্তমান আধুনিক যন্ত্রাংশের উপর নির্ভর করেও যে একটা সুন্দর কিছু উপহার পাঠকদের উদ্দেশ্যে স্থাপন করা সম্ভব তার সফলতম প্রমাণ এই "***বই কুটির কলকাতা***"। এই সফলতা অর্জন করেছি শুধুমাত্র আপনাদের চাহিদা ও ভালোবাসার কারণে।

চতুর্থ সংখ্যার পর এবার "***বই কুটির কলকাতা***" আপনাদের সামনে তুলে ধরছে বৈশাখী সংখ্যা ১৪২৯। এই সংখ্যায় ষোলো আনা স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন বাঙালিয়ানার। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের ভাবনা হারিয়ে যাওয়া কিছু বাঙালিয়ানা স্মৃতিগুলোকে পাঠকদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা। তাই আমরা খুবই উৎসাহী এই সংখ্যাটি কে নিয়ে, কারণ আপনাদের ভালোলাগাই আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। আশা করব আপনাদের এই সংখ্যাটি খুবই ভালো লাগবে এবং আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ রইলো, যে কোনও প্রকার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে তা সংশোধন করিয়ে দেবেন, যাতে আমরা আগামী দিনগুলোতে আরো পরিপূর্ণ হতে পারি।

***

সম্পাদকীয়

প্রত্যেকটি চারাগাছ স্নেহ-ভালবাসা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিণত হয় মহীরুহে। ঠিক একই রকম ভাবে আপনাদের স্নেহে ও সহযোগিতায় আজ 'বই কুটির কলকাতা' তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহীরুহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আশা রাখি, বাংলা তথা বাঙালীয়ানার ক্ষেত্রে '***বই কুটির কলকাতা*** বটবৃক্ষের ন্যায় স্থান করে নিতে পারবে বাংলার সাহিত্য মহলে। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পাড়ি দিয়ে আজ আমরা পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, আর এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের লেখক-লেখিকা, চিত্রশিল্পী ও বিশেষ করে পাঠকদের চাহিদার মাধ্যমে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনাদের জন্য '***বই কুটির কলকাতা*** নিয়ে এসেছে "*বৈশাখী সংখ্যা ১৪২৯*"। বাংলার বাঙালী তথা বাংলা ভাষার তাগিদে সম্পূর্ণ বাঙালীয়ানা কে মাথায় রেখে আমরা প্রকাশ করছি "*বৈশাখী সংখ্যা ১৪২৯*"।

লেখক-লেখিকা, চিত্রশিল্পী ও পাঠকগণদের ছাড়া আমরা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি এই বটবৃক্ষের বেড়ে ওঠার জন্য যারা মাটি ও জলের যোগান দিয়েছে তারা হলো এই '***বই কুটির কলকাতার*** প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে দিনের সেই চারা গাছটি মহীরুহের দিকে অগ্রগণ্য। প্রত্যেক তাদের নিজ নিজ কর্মযজ্ঞের ফাঁকে সময় বের করে যে ভাবে '***বই কুটির কলকাতা*** কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সর্বোপরি আমরা খুবই ভাগ্যবান গত সাত মাসে পরপর পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে। তাই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি শুভজিৎ কুন্ডু '***বই কুটির কলকাতা*** র পরিবারের সকলকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করব পূর্বের মত আগামী দিনগুলোতেও আপনারা সকলে '***বই কুটির কলকাতা*** কে ঠিক এমন ভাবেই ভালো বাসবেন এবং পাশে থাকবেন।

বই কুটির কলকাতা

উজ্জ্বল নিদর্শন...

অঙ্কন প্রতিযোগিতার সেরা দশ...

বিভাগ-"গ" (বয়স সীমা - ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত)

অপলা মিত্র
বয়স - ১৮

সুস্মিতা দাস
বয়স - ১৩

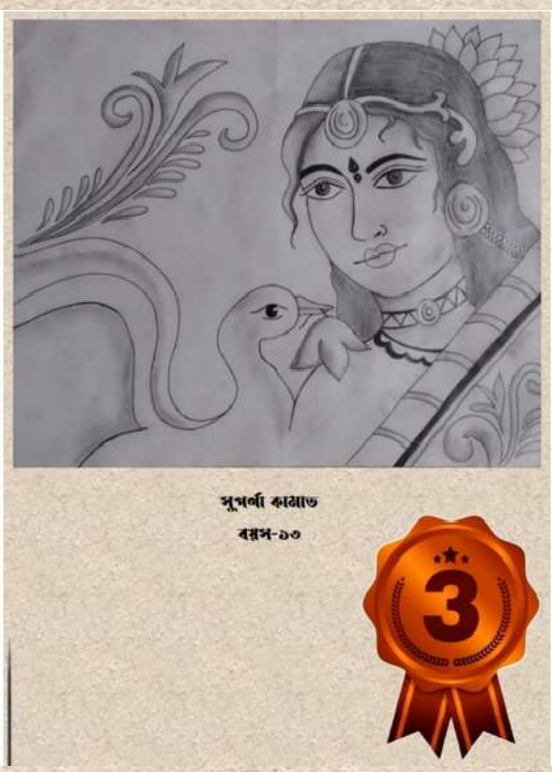

সুপর্ণা কায়াত
বয়স-১৩

বিভাগ-"ক" (বয়স সীমা - ৬ বছর পর্যন্ত)

বিভাগ-"খ" (বয়স সীমা - ৭ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত)

সিলভিয়া ভৌমিক
বয়স - ১০

স্বর্ণাভ সর্দার
বয়স - ১২

তৃষিসিক্তা বেজ
বয়স - ৭

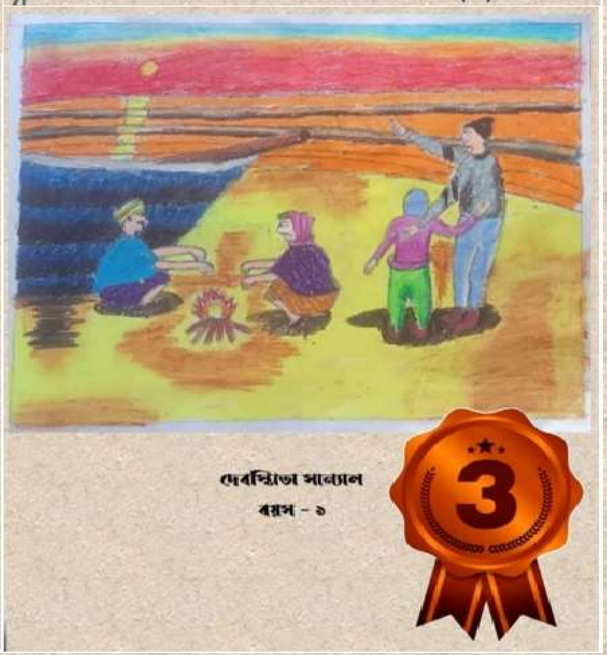

দেবস্মিতা সান্যাল
বয়স - ৯

***

বই কুটির কলকাতা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডুনালী বেজ (প্রচ্ছদ)

সীমন্ত রায়

ঋষি ঘোষ

রিয়া ভট্টাচার্য

এবং

অপলা মিত্র

সূচীপত্র

অনুভূতি

মেলা

কিশোর ঘোষ

তোমার জন্মদিনে

নার্গিস সুলতানা

কবিতা

অগ্রণী বাঙালি

দীপঙ্কর বিশ্বাস

বৈশাখী নব স্পর্শ

মেরী খাতুন

কর্মস্থান

জগন্নাথ মন্ডল

নববর্ষ ও বন্ধ্যুৎসব

-রণজিৎ মাইতি

প্রার্থনা

অন্তঃসলিলা

বান্ধবী – নন্দিনী

বীনা সেনগুপ্ত

ছোটো গল্প

সব 'বর্ষা' এমন শুভবেই পাক

সুপর্ণা দে

বউ

শর্মিষ্ঠা মিত্র চক্রবর্তী

মিষ্টি Problem

পল্লবী সান্যাল

বেড়ানো ডুয়ার্সের জঙ্গলে এবার থেকে অন্য ভাবে

অতন্দ্র প্রহরী

এক অন্য নববর্ষ

ছেঁড়া ঘুড়ি।

পয়লা-র প্রবর্তক

সীমন্ত রায়

বাঙালীর খেলাধুলো : বিশ্বজয়ের মিহির উদয়

সুনন্দ সান্যাল

ভারতবর্ষে মুঘলদের শাসনকালে বাংলার জনজীবনে তাহাদের প্রভাব

রবীন মুখার্জি

গল্প

প্রেম এসেছিল নীরবে

সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

বারো মাসে তেরো পার্বন

প্রদীপ রায়

রঙ্গিনীর তুর্বিনাচন

দিব্যেন্দু ঘোষ

সাহিত্যি সভায় ও সেবায়

আম বাঙালির চালচলন

দীপঙ্কর বিশ্বাস

মেলবন্ধন

পল্লবী সান্যাল

পয়লা বৈশাখ

মেরী খাতুন

অগ্রণী বাঙালি -

দীপঙ্কর বিশ্বাস

আটপৌরে আলগোছা জীবনে
মোটা ফ্রেমের চশমায় ছিল বাঙালির আকাশ দেখা।
গভীর চোখে একমুখ দাড়িতে
কেরানীর ছেলেও ছিল আজন্ম ভাবুক কবি।
বাঙালি ডাল ভাত পোস্ততে শান্তি পেলে
মাসে বড়জোর একদিন পাঠার মাংস খুঁজতে !
একদিন ছিল সে ভেতো বাঙালি...
তার ছিল তেলা পাতানো মাথা,
দেখতে যেন ভীষণ ক্যাবলা!
তাও কবিতা লিখত একপেট খিদে নিয়ে..
তখন বাঙালির দর ছিল সমাজে-
আর যাই হোক সে বাঙালি দেশকে ভাবাতো।
জীবনে কিছু না পারুক রবি ঠাকুরের গান গাইত!
অস্তিত্বে জোড়াতাপ্পি দেওয়া সংসারে
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়...
দিন আনা দিন খাওয়া তার রোজনামচা...
বড়লোক না হলেও সে বাঙালির দর্প ছিল!
গরীব হলেও সঙ্গীত বুঝত,
সংস্কৃতি বোধ ও দর্শন পবিত্র রাখত বাঙালির মন।

আজকের আড়ম্বর বাঙালির অশ্লীল কাব্য
স্বভাবে চাঁদের স্পর্শে অন্তরঙ্গের ঐশ্বর্য্য।
বাঙালি যেন অভব্য বিপন্ন ভাবনার জাতি!
তাদের বহিরাঙ্গে জ্যোতি,
পাশ্চিমী বাতাসে মতি,
স্ব-ধর্ম চ্যুত বাঙালি
খামচে নেওয়া সংস্কৃতির এখন অনুগত ভৃত্য!
তাই বাঙালি এখন ছোট প্যান্টে বেশ খাসা!
মুরগির মাংসে অপরাধ বোধ মিশিয়ে
রান্নার হেঁসেলে কোলেস্টেরল মাপে....
তাও যেন ভালো ছিল সে ঘরকুনো সাবেক বাঙালি!
এখন সুযোগ পেলেই বাঙালি তন্ত্রে পাড়ি দেয়!
তাই বিকৃত বাংলা ভাষা,
তাও আন্তর্জাতিকতা বাঙালির যত ভাবনা!
বাঙালি কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল..
তারপর অনেক দশক পেরিয়ে গিয়েছে....
গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে কত শত ইতিহাস...
তাও বাঙালি আজও ভাবে
তবে সে ভাবনায় সারা দেশ কি জোড়ে?

বৈশাখী নব স্পর্শ

মেরী খাতুন

নতুন সকাল তুমি কি দেখেছো?
দিনের শুরুতে উজ্জ্বল আকাশ।
সবুজ ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু শিশির
কেমন মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে।
সকাল, দুপুর, বিকেল হতে রাত গড়াল,
অথচ আলোমেলো হয়ে
রিনিঝিনি নূপুরের শব্দটাই হারালো।
হিংসা, বিষাদ, বিভেদ যেন,
তোমার গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে।
মাটির প্রতিমা কাঁদে দেবালয়ে-
মসজিদে কাঁদে মোমিন,
দুঃখিনী জননী জাগে সারারাত
কেঁদে কেঁদে মাটির ঘরে।
জাতের ভিড়ে পুড়ছে সমাজ,
জ্বলছে নৈরাজ্যের দাবানল;
এ কেমন সকাল? নতুন সকাল।
চলো হাঁটি শিশির ভেজা সবুজ মাঠে
আর গায়ে মাখি নতুন দিনের সূর্যকে।
প্রতিটি হৃদয়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেসে বেড়াক
নতুন বছরের আনন্দ।
সেজদায়, প্রার্থনায়, ইবাদতে, ভালোবাসায়
করো ক্ষমা হয়ে মলিন।
মুক্তির বার্তা নিয়ে হাতে হাতে
সাজাবো স্বপ্নভুবন।
উড়াবো চারিদিকে শান্তির ধ্বজা
এই অঙ্গীকার নিয়ে আসুক নতুন সকাল।
তবেই সম্ভাবনার শুভ নববর্ষের
বৈশাখী নব স্পর্শ, সবাই পাবে।।

কর্মস্থান

-জগন্নাথ মন্ডল

দুটি স্থানই পবিত্র,
জন্মস্থান ও কর্মস্থান।
একটাই পাদস্পর্শ কবি রবীন্দ্র,
অন্যটায় কবি নজরুল ইসলাম।
একটাই কবি জয়দেব,
অন্যটায় বিদ্যার সাগর।
একটাই শান্তি নিকেতন,
অন্যটায় চিত্তরঞ্জন।
দুবরাজপুর জন্মস্থান,
চিত্তরঞ্জন কর্মস্থান।

নববর্ষ ও বসন্তোৎসব

-রণজিৎ মাইতি

সংস্কার আজও মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়
নাকি সেখানেও উঁকি দেয় চোখ গ্যালো পাখি ?
চকোরের মতো পান করে চৈত্র শেষের ম্লান জ্যোৎস্নার আলো
এই মায়াবী ভোরে আগুনের মতো আমাদেরও ক্ষুধা শাশ্বত
জ্বলুক আগুন চারপাশে দাউদাউ করে
এ জীবন এভাবেই কি এগিয়ে যায় মহাজীবনের পথে?

মেয়েটিরও যতো উৎসাহ ওই আগুন প্রতি
দোলের নাড়াপোড়া শেষে তাকিয়ে থাকে তাই পড়লা বৈশাখে
শীতের ঝরা-মরা পাতা জড়ো করে ভিটেতে একটু ইন্ধন
আহা কী যে আনন্দ পায়; যেন আস্ত বাড়িটি পুড়লেই ওর আশ মেটে!
মনে হয় এই আগুন তৃষ্ণাই নতুন সকালের স্বপ্ন দেখায়
আমি সে আগুনে সেঁকে নিই আনকোরা হাতি

বিদগ্ধ আঙুলই পারে কলম ধরতে
যেমন অভিজ্ঞ চাষি ধরে লাঙলের হাল
তাই একে একটা মরা পাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই তাই দগদগে আঁচে

আরে এই ঝরা পাতাটাই তো নুসরতের ধর্ষক
জ্বলুক পুড়ুক
এই তো সেই মুসকোর পুলিশ অফিসার
ছাই হয়ে যাক
দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক যে পাতাটি
দগ্ধে দগ্ধে মরুক জ্বলন্ত আগুনে
শেষ শুকনো পাতাটি ছিলো আপন কলুষ
সেটুকুও বিসর্জন দিই বৈশাখী উৎসবে
পুড়ে যাক, নববর্ষের ভোরে ছাই হোক আমাদের যতো জীর্ণ সংস্কার

যদিও ইতিহাসের পাতা আজও চকচক করে ভস্মে ঢালা ঘিয়ে !
হায়! এই বসন্তোৎসবও কি দেখাবে না একে চলতে আশার আলো?

প্রার্থনা

অন্তঃসলিলা

অনেক দিন এসেছি ভবে,
অনেক হয়েছে বেলা।
জানি না কবে আবার দেখা হবে
ওপারে রয়েছে কাজের মেলা।
এপারে ফুরায়েছে প্রয়োজন,
সাঙ্গ করি কাজ
হয়েছে সময় আজ
করছি এবার ওপারে যাত্রার আয়োজন।
আত্মীয় বন্ধু আছো যত
ক্ষমা করো মোরে ভুল করেছি যত।
প্রাণের প্রিয়, ওগো সখা,
শেষ সময়ে দিও দেখা।
প্রাণবায়ু সম
ওগো প্রিয়তম
বিদায় বেলা দিও তব পদরেণু মস্তকে মম।
মনে রেখো ওগো প্রিয়তম।
স্বজন আর সুজন তুমি মোর প্রাণাধিক প্রিয়জন,
কৃপা করে অন্তিমকালে দিও দরশন।

বান্ধবী – নন্দিনী

বীনা সেনগুপ্ত

ওগো বন্ধু, নন্দিনী
তুমি যে আমার অন্তরের সখা
আমারই যত অন্যায় তুমি করিয়াছ ক্ষমা,
তুলনা নেই কো তোমারই মমতা ;
আজ তুমি নেই কো আমারই পাশে,
তাই তো আমি সাথীহারা,
তোমার প্রিয় সাথীরে ছেড়ে গেছো দূরে,
কাহারে বলিব সেই প্রাণের কথা?
প্রার্থনা জানাই তুমি থেকো সুখে,
রেখো তুমি আমারে মনে,
তুমি যে আমার বান্ধবী,
আমি যে আজ একাকিনী,
তুমি মোর প্রিয় নন্দিনী।।

***

চিত্রশিল্পীঃ সীমন্ত রায়

সব 'বর্ষা' এমন শুভকেই পাক

সুপর্ণা দে

শুভ- জানিস আমি তোকে কতটা ভালবাসি?

বর্ষা- তুই কোনদিন আমায় বলেছিস?

শুভ- যতবারই তোকে বলতে যাবো ভেবেছি ততবারই আটকে গেছি। ভেবেছি তুই যদি আমায় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাস।

বর্ষা- তোর এমন ভাবনার কারণটা কী? শুনি

শুভ- কোনোদিন কাউকে 'ভালোবাসি' এই কথাটাই বলিনি। তাই ভেবে উঠতে পারছিলাম না কীভাবে শুরু করব।

বর্ষা- তো আজ কীভাবে বললি?

শুভ- আজ অনেকভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলাম?

বর্ষা- কী করেছিলি?

শুভ- আরে তোকে মনের কথাটা বলব বলে নিজেকে তৈরি করেছিলাম।

বর্ষা- হা হা হা। তারপর?

শুভ- প্রচন্ড গরম লাগছে?

বর্ষা- সেকি! ঠিক আছিস তো?

শুভ- হ্যাঁ। ঠিক আছি।

বর্ষা- এনে জল খা।

শুভ- (জল খেলো)। এই পাঞ্জাবিতে আমায় ভালো লাগছে?

বর্ষা- হ্যাঁ। ভালো লাগছে। কেন আজ হঠাৎ পাঞ্জাবি পরলি?

শুভ- ওই যে তোকে ভালোবাসি কথাটা বলার জন্য নিজেকে তৈরি করতে গিয়ে।

বর্ষা- তুই অনেক দেরি করে ফেলেছিস।

শুভ- (কিছুক্ষণের জন্য পুরো চুপ। খানিকটা আকাশ ভেঙে পড়ার মতো) কেন?

বর্ষা- (নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে) তুই কি সত্যি আমায় ভালোবাসিস?

শুভ- ভালোবাসি। কিন্তু এতদিন বলতে পারিনি। সত্যি খুব ভালোবাসি। কিন্তু তুই বললি যে আমি দেরি করে ফেলেছি। কেন বললি? দেখ সবাই তো সবার মনের কথা তাড়াতাড়ি জানতে পারে না। তুই কি অন্য কাউকে পছন্দ করিস?

বর্ষা- না। তবে একজনকে এতদিন মনে মনে পছন্দ করতাম।

শুভ- ও তুইও তাহলে বলে উঠতে পারিসনি বল?

বর্ষা- হ্যাঁ বলিনি।

শুভ- কে সে?

বর্ষা- সে আছে একজন।

শুভ- আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের কেউ?

বর্ষা- হ্যাঁ।

শুভ- (আরও খানিকটা ভেঙে পড়ল)। নামটা বল।

বর্ষা- বলব। বলব। সময় চলে যাচ্ছে না।

শুভ- তা আজ হঠাৎ শাড়ি পরলি?

বর্ষা- পরলাম। মনে হল আজ আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন। তাই।

শুভ- সেটা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু হল কোথায়! সত্যিই দেরি করে ফেললাম রে।

বর্ষা- তুই কি আমায় বিয়ে করবি?

শুভ- মানে?

বর্ষা- মানে আবার কী! তুই বিয়ে করবি আমায়?

শুভ- হ্যাঁ। মানে...(শুভর কথা আটকে আটকে যাচ্ছে কথা) আমি তো,.. মানে ,.. তাই বললাম। তুই বললি, দেরি করে ফেলেছি আমি।

বর্ষা- হ্যাঁ। তা দেরি করিসনি? এই কথাটা বলতে তুই ৬ বছর ৮ মাস ৭ দিন লাগিয়ে দিলি! আমি তো তোর অপেক্ষায় ছিলাম। তুই না বললে আর কয়েকদিন পর আমিই বলতাম।

শুভ- কি? তুই এত হিসাব রেখেছিস?

বর্ষা- রেখেছি। প্রথম যেদিন তোর সঙ্গে দেখা হল। সেদিন তোর আমার সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি, ফোন নম্বর চাওয়া, আমার বাড়ির লোক কেমন আছে রোজ জিজ্ঞাসা করা, আমি ভালো আছি কিনা সে খেয়াল রাখা। সমস্তটা আমায় ভাবিয়েছিলো। তারপর থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম।

শুভ- আমি সত্যি তোকে ভালোবাসি। সারা জীবন আগলে রাখবো। আর বিয়েও করব। শুভ নববর্ষ।

বর্ষা- নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই তোকে। আজকের দিনটা সত্যি স্পেশাল।

শুভ- হ্যাঁ। সত্যি রে। চ কয়েকটা দোকানে হালখাতা করতে যাওয়ার আছে। যাই।

বর্ষা- হ্যাঁ। চল প্রচুর মিষ্টি খাব। এই কোল্ড ড্রিঙ্কস দেবে তো ওই দোকানগুলোতে?

শুভ- হ্যাঁ। দেবে রে। এবার চ। নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে...

***

চিত্রশিল্পীঃ রিয়া ভট্টাচার্য

বউ

শর্মিষ্ঠা মিত্র চক্রবর্তী

সন্ধেবাতিটা দুই বারে নিভলো। "জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে রেখেছো কেনো? ঘরে আলো জ্বলেছে, বাইরে থেকে সব দেখা যাচ্ছে, তুমি না ঘরের বউ?"

তুলে নেওয়া একগোছা কাঁচের চুড়ি তখন হাতে, ধীর পায়ে রান্নাঘরে এসে থামলো, কাঁচের চুড়িগুলো নরম হাতের পেশীর চাপে ভেঙে কখন হাতে ঢুকে গিয়েছে , রক্ত পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা মাটিতে - "আরে, একি!" দৌড়ে এসে চেঁচামেচি শুরু করল রশিদ। ঘাড় ঘুরিয়ে রাণি তাকালো - সে দৃষ্টিতে কী যে ছিল! আগুন? ঘেন্না? না কি আরও কিছু?

ঠান্ডা গলায় বলল, " সারা রাত সোহাগ করে এখন!"

" আরে ছাড় তো, ওসব রাস্তার মেয়ে, তুই না ঘরের বউ " আহ্লাদী স্বর রশিদের গলায়।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রাণি। থেমে গেল। বাঁকা হাসি তাঁর সুডৌল আলগা ঠোঁটে, " তাই যদি হতে পারতুম, রাস্তার মেয়ের সোহাগ পাওয়ার অধিকার আছে যে, আমার ইচ্ছা- কাম থাকতে নাই, আমি তো ঘরের.."

না বলতে পারল না কথাগুলো। শরীরটা তার রাগে, দুঃখে, অপমানে যেন ঘুমিয়ে থাকা পিন্ড পিন্ড লাভা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, কেমন যেন গুমোট, জানালাটা খুলতে হবে, হরমুড়িয়ে উঠলো রশিদ, ' বউ !' চেঁচিয়ে উঠে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটা হাল্কা গোঙানির শব্দ। এগিয়ে গিয়েই দাঁড়াল। রাণি সোজা দাঁড়িয়ে, চোখ দুটো দেখে রশিদ ঘাবড়ে গেল। এমনটাতো, বুক থেকে আঁচলটা টেনে ফেলে দিল রাণি, রশিদ স্পষ্ট শুনতে পেল স্তব্ধ হক খোলার শব্দ, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো রশিদের।

***

মিষ্টি Problem

পল্লবী সান্যাল

রসগোল্লা ভালোবাসে লাড্ডুকে। এদিকে পান্তুয়ার আবার রসগোল্লাকেই চাই। গায়ের রং গাঢ় বলে রসগোল্লার মোটেই পছন্দ নয় পান্তুয়াকে। সাদা ধবধবে গায়ের রং নিয়ে বেশ অহঙ্কার করে বেড়ায় মিষ্টি মহলে। লাড্ডুর সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারটা ভালো ভাবে নেয়নি রসগোল্লার মা কালোজাম।

মায়ের সঙ্গে রসগোল্লার কথোপকথন,

কালোজাম :তুই এটা কি করলি! একটা রসকসহীন ছেলেকেই মনে ধরল তোর! কেমন সারা গায়ে গোটা। রং আবার হলদে। জামাই মোটে পছন্দ নয় আমার।

রসগোল্লা : আমার বেলায় যত নাক কোচকানো। বাবাকে কী দেখে পছন্দ করেছিলে?

কালোজাম : তোর বাবা রাজভোগের সঙ্গে তুই লাড্ডুর তুলনা করছিস! দোকানে কার দাম বেশি রাজভোগ না ৬ টাকার লাড্ডুর?

রসগোল্লা : আমায় একটা কথা বলোতো মা, তুমি কালোজাম, বাবা রাজভোগ, মাঝখানে আমি সাদা রসগোল্লা এলাম কোথা থেকে?

কালোজাম : আমি কী জানি। ভগবানের দান তুই। ভগবানকে গিয়েই জিজ্ঞেস কর।

রসগোল্লা : (মনে মনে) লাড্ডুর কথাই ঠিক তাহলে। মা বাবাকে বিয়ে করলেও পাশের পাড়ার রসগোল্লা কাকুর সঙ্গে....

কালোজাম : তা চুপ করে গেলি যে বল। লাড্ডুর হয়ে আর কী বলবি ভেবে পাচ্ছিস না তো।

রসগোল্লা : লাড্ডুর রস নেই তো কী। আমার তো আছে। এই রসেই আমরা সাঁতার কাটব সারাজীবন। তোমরা মানলে ভালো। না মানলেও আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না। দাদা দরবেশ আমাদের সঙ্গে আছে।

***

বেড়ানো ডুয়ার্সের জঙ্গলে এবার থেকে অন্য ভাবে

আতন্দ্র প্রহরী

মন সতেজ করে তোলে উত্তরের সবুজ জঙ্গলের হাতছানি।যে কোনও অরণ্যভূমি এবং তার লাগোয়া অঞ্চলে বেড়ানোটাকে অন্য ভাবে ভাবি,এটা কি খুব জরুরী? ডুয়ার্সে এলে বন্যপ্রাণীই দেখতে হবে,আমরা যদি আপনার বেড়ানোটাকে স্মরনীয় করে তুলি একটু অন্যভাবে....

উত্তরবঙ্গের অন্যতম আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র ডুয়ার্স। তিস্তা - সঙ্কোশ নদী ডুয়ার্সকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। নদীর পূর্বের অংশকে বলা হয় পূর্ব ডুয়ার্স বা অসম ডুয়ার্স এবং পশ্চিমের অংশকে বলা হয় পশ্চিম ডুয়ার্স বা পশ্চিমবঙ্গ ডুয়ার্স।মহানন্দা-তিস্তা-সঙ্কোশ। নদী উত্তরের প্রকৃতিকে আপন করে সাজিয়ে তুলেছে। মহানন্দা তিস্তার মাঝে রয়েছে সবুজ গালিচায় তরাই। চা বাগান নদী আর ঐতিহ্যবাহী জঙ্গল বৈকুণ্ঠপুর। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখায় যার কথা আমরা পেয়ে থাকে।এখানে পাওয়া যাবে মহানন্দা ওয়াইল্ডলাইফ এর লাগবে গুলমা জঙ্গল ও বেঙ্গল সাফারি।

অপরদিকে সঙ্কোশ-তিস্তার মাঝে একাধিক অভয়ারণ্য রয়েছে ডুয়ার্সে। গরুমারা, বক্সা, জলদাপাড়া, মহানন্দা। আর অসমের দিকে রয়েছে কাজিরাঙা আর মানস জাতীয় উদ্যান।

তরাই-ডুয়ার্সের সবুজ জঙ্গলের হাতছানি মন সতেজ করে তোলে। গোরুমারা অভয়ারণ্যে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র গন্ডারের দেখা মেলে। এই জায়গা গন্ডার প্রজনন স্থান হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। পর্যটকদের জন্য হাতি সাফারির বন্দোবস্ত রয়েছে।

ডুয়ার্সের সবুজ জঙ্গলের হাতছানি মন সতেজ করে তোলে। ডুয়ার্সের জঙ্গলের অন্যতম আকর্ষনীয় কেন্দ্র জয়ন্তী। সেখানে জল আর জঙ্গলের সহবস্থান। আলিপুর দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করা যায় ডুয়ার্সে।

প্রতিবছরই পর্যটকরা ভিড় করেন এই গোরুমারা অভয়ারণ্য দেখতে। এইভাবে ডুয়ার্সের সবুজ জঙ্গলের হাতছানি মন সতেজ করে তোলে

চলুন অন্য চোখে দেখা শুরু করি এবার।

একবার এই করোনার সময় চাইলেও কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে আপনার মনের যন্ত্রনা দুঃখ কষ্ট হালকা করতে পারছেন না,কিন্তু এখানে ঘুরতে এলে পাবেন এমন এক বন্ধুকে যে নীরবে আমাদের কে ভালবেসে অনেক কিছু দিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে,আপনি তাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলে দেখবেন অনেক হাল্কা হয়ে যাবেন এক অনাবিল আনন্দ আপনার চোখে মুখে লেগে থাকবে এবং সেই সাথে বন্ধুত্বের সাক্ষী হিসেবে একটা লাল সুতোর রাখি বেঁধে দিলেন। লাল সুতো টা এই জন্য উল্লেখ করছি যে,কোন কাঠ চোর গাছ কাটতে এলে লাল সুতার বাঁধন দেখে ধর্মের ভয়ে গাছটি আর কাটবে না,অর্থাৎ আপনি বন্ধুকে বাচিয়ে রেখে একসাথে প্রকৃতির সংরক্ষণের কাজ করলেন। আমরা একে 'বৃক্ষ থেরাপি' ও বলে থাকি।

আগামীর পর্যটন। এ হলো বন বান্ধব বৃক্ষ:ময়না গাছ।

ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে কখনো কোনও ময়না গাছের নিচে দাড়াবেন,ময়না গাছ ডুয়ার্সের বুকে দীর্ঘায়িত গাছ এই গাছের কমার্শিয়াল ভ্যালু নেই কিন্তু জীববৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই গাছ হলো ধনেশ পাখির আবাসস্থল,ময়না গাছ খুব নরম বলে এখানে কুঠরি বানিয়ে ধনেশ পাখিরা বাচ্চা ফুটিয়ে তোলে আর গাছটি মরে যখন তখন নরম হওয়ায় খুব দ্রুত পচে যায় নরম থাকায় অনায়াসে কিছু পোকা মাকড়ের ভরসার আবাসস্থল হয়ে উঠে। ডুয়ার্সে বেড়াতে এলে এই গাছের খোঁজ নেবেন বনবন্ধু কিংবা গাইড এর কাছে।

জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে যখন গন্ডার,বাইসন বা হাতি হরিন দেখেন কখনো কি কোন গাইড বন্ধুকে প্রশ্ন করেন যে এরা তো সব তৃণভোজী প্রানী এদের প্রিয় খাবার কি? কি কি ঘাস এরা খায়, কেউ কেউ হয়তো জানেন

চেপ্টি, টাড্ডা নলখাগড়া ঘাস খায় কিন্তু কোনটা কি ঘাস জানতে চাইছেন কি? এবার এলে অবশ্যই জানতে চাইবেন।

উত্তরের জঙ্গলে বেড়াতে এসে অনেকে পানীয় লুকিয়ে নিয়ে আসেন ব্যাগে করে। তারপর সেগুলো ব্যবহার করে খালি কাঁচের বোতল গুলো জঙ্গলের ভেতরের ছুঁড়ে ফেলে দেন। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক মারাত্মক এবং অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ড বন্য প্রাণীদের প্রতি। কারণ বন্যপ্রাণীরা যখন চলাফেরা করে তাদের পথে এই ভাঙ্গা বোতলের কাঁচ পায়ে গেঁথে যায় সেখান থেকে রক্ত বের হয়। রক্ত মাখা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা উদ্ধার হয়েছে এবং আহত হাতির পা দিয়ে রক্ত গড়িয়েছে যা কোনমতেই পর্যটকদের কাছে কাম্য নয়। এছাড়া চকমকে রঙিন পোশাক কিংবা উগ্র পারফিউম ব্যবহার করবেন না যখন জঙ্গলে প্রবেশ করবেন এতে বন্যপ্রাণীরা স্বাভাবিক আচরণ করে না। এমনকি পর্যটকদের প্রাণসংশয় হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের খুঁটিনাটি সাবধানতা অবলম্বন জরুরী ডুয়ার্সের জঙ্গল এই বেড়াতে এলে।

আবার জঙ্গলের এমন অনেক অংশ আছে যেখানে আপনারা হেটে বেড়াতে পারেন,যেখানে বন্যপ্রাণীর আক্রমনের ভয় নেই সেখানে হঠাৎ কোনও গাছের সাথে জড়িয়ে থাকা ট্রিফার্ন বা অর্কিড দেখে দুদণ্ড দাড়িয়ে প্রকৃতির আশ্চর্য সৃষ্টি কে উপভোগ করবেন এবার এলে।

এমন আরো অনেক কিছু আছে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু আমরা ঘুরতে এসে একটা গন্ডার যদি না দেখতে পাই তখন মনে হয় ঘোরাটাই বৃথা হয়ে গেল। অথচ আমরা যখন ঘর থেকে বের হই বলি জঙ্গলে বেড়াতে যাচ্ছি,হ্যাঁ মনটাকে এই ভাবেই তৈরি করে আসুন যে আপনারা শুধু জঙ্গল দেখতে আসছেন তাহলে কোনদিন নিরাশ হবেন না,যদি কোন হাতি গন্ডার বাইসন, প্যাঙ্গোলিন, পাইথন , সম্বর হরিণ সজারু অথবা রাতে বন্য শুকর ,ব্ল্যাক প্যান্থার বন্যপ্রাণী দেখতে পান সেটা হবে বোনাস।

নদীর পার্শবর্তী অঞ্চলে বা ঝর্না প্রবন এলাকায় শিমুল গাছ বা অন্য কোনো বড় গাছের গোড়ায় ভাগ ভাগ করে ছড়িয়ে থাকে কেন? আসলে ও গুলোকে বাট্রেস বলা হয় এবং এটাও প্রকৃতির এক দান। ঝড় বাদলের

সময় অজগর সাপ বা ছোট ছোট প্রাণী যাতে এই ভাগ ভাগ জায়গায় নিরাপদে থাকতে পারে তাই ভগবান বানিয়েছে এমন করে,তাছাড়া বাটরাসে অজগর সাপ ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় নেয়।

এছাড়াও ডুয়ার্সের বিভিন্ন ধরনের গাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নানান ধরনের রং এর সুমধুর কণ্ঠি পক্ষীকুল। এগুলোকে দেখবেন অনুভব করবেন। উপলব্ধি করবেন তাদের কলতান।

রয়েছে নানান ধরনের অর্কিড, ভেষজ গাছ, গুল্ম লতাপাতা যেগুলো ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময় কালে। এগুলো শরীর মনকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি প্রদান করে থাকে। এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করবেন ডুয়ার্সের জঙ্গলে বেড়াতে এলে।তাই আসুন আমাদের বেড়ানোটাকে এবার থেকে উপলব্ধি করবেন একটু অন্যভাবে। তাই আসুন আমাদের বেড়ানোটাকে এবার থেকে অন্য ভাবে ভাবি। উত্তরের বনভূমি এভাবেই প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। পর্যটকদের কাছে তা উদ্ভাসিত হোক নতুন ভাবনায় নতুন দিশায়।

***

চিত্রশিল্পীঃ রিয়া ভট্টাচার্য

এক অন্য নববর্ষ

-ছেঁড়া ঘুড়ি।

নববর্ষের এক প্রেম যা পূর্ণতা পেয়েছিল,অন্য এক নববর্ষে। জিৎ ও বৃষ্টি (মানি)।

আলাপ হয়তো বহুদিনের নয় দুজনের, কিন্তু বইমেলার প্রথম দেখায় হঠাৎ করে খুব ভালো লেগে যায় জিৎ এর বৃষ্টিকে। সেই ভালোলাগা কখন যে ভালবাসায় পরিণত হয়, বুঝে উঠতে পারিনি সে নিজেই। বন্ধু-বান্ধবের সাথে বই মেলায় ঘুরতে এসে হঠাৎ আলাপ বৃষ্টির সাথে। প্রথম আলাপ বলাটা ভুল হবে প্রথম দেখা, এর আগে এক বন্ধুর সুবাদে তাদের আলাপ খুব একান্তে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দু'জনের একজনেরও জানা ছিল না এই আলাপ পরিণত হবে এক মিষ্টি প্রেমে।

বৃষ্টির ডাকনাম মানি। প্রথম চায়ের ভাঁড়টা জিৎ এর হাত থেকে, অনেকটা গল্প অনেক আড্ডা আর কিছু পরিকল্পনা নিয়ে সেদিনের মতো বিদায় জানালো দু'জন দু'জনকে। হয়তো প্রথম আলাপে মানির তেমন কিছু মনে হয়নি কিন্তু জিৎ হয়তো পেয়েছিল তার না পাওয়া ভরসার হাত টা।

অনেকদিনের চাওয়া ঠিক এমনই এক কাছের মানুষ। আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করে জিৎ। সকালের গুড মর্নিং আর রাতের গুডনাইট, ভালো থেকো, এসএমএসটা দিয়ে। কিন্তু ছটফটে, প্রাণোচ্ছল মানি তখনও

হয়তো ঠাহর করতে পারিনি একটা অচেনা অজানা ছেলে কয়েকদিনের আলাপ, হঠাৎ দেখা সে কেন তার এতটা খোঁজ নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে মনি। সবার সামনে না দেখালেও অনেকটা বিচলিত অনুভব করতে থাকে জিৎ। সে কি একবার ফোন করবে? না এসএমএস করেই খবর নেবে মানির? এই দোনামোনা চলতে থাকে মনের ভিতর। কিছুটা সাহস করে এসএমএস টা করেই ফেলে জিৎ," কেমন আছো এখন" সকালের এই এসএমএসের উত্তর পেতে পেতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে শহর তিলোত্তমায়।

সন্ধের চায়ের আড্ডায় ক'দিন ধরেই একটু মনমরা জিৎ। যে ছেলেটা সকল সময় সবাইকে মাতিয়ে রাখতো, তার মুখরোচক কথায় কিংবা অঙ্গ ভঙ্গিমায় সে কয়েকদিন প্রায় চুপ। হঠাৎ মোবাইলের জ্বলে ওঠা আলোটা জানান দেয় একটা রিপ্লাইয়ের "আগের থেকে একটু ভালো আছি, অফিসের কাজ করছিলাম

তাই রিপ্লাই দিতে পারিনি।" একটু হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস, সাথে ঠোঁটের কোণায় মৃদু একটু হাসি। আজ আর ভালো লাগছে না বুঝলি, বাড়ি যাই আড্ডার মাঝে জিতের এমন উক্তিতে একটু হতচকিত তার বন্ধু মহল। মহাভারতের যুদ্ধ যেমন কৃষ্ণ ছিল সবটাই তারই লীলা খেলা, এই ভালোবাসার যুদ্ধে ও জিৎ এর এক বন্ধু ছিল সে কৃষ্ণ না হলেও, সবটাই জানতো সে, তার মুখেও মৃদু হাসি, হাঁ তুই বরং আজ বাড়িই যা। রাতের সিগারেটটা কিনে জিৎ বাড়ি ফিরে আসে, আর মনে মনে ভাবতে থাকে কীভাবে তার সাথে আরও বেশি করে কথা বলা যায়। কিভাবে তাকে তার মনের কথা জানানো যায়ে। একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে মানি। অফিসের কাজ আর শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে কিছু কিছু কথা হতে শুরু করে জিতে সাথে।

হঠাৎ একদিন রাতের বেলা ফোন করে বসে জিৎ মানিকে। সে এক স্মরণীয় রাত। প্রেমের প্রথম কথা। একথা গুলোর মধ্যে কোনরকম চাতুরী নেই। নেই কোন দেনা-পাওনার হিসাব। কথার পিঠে কথা বসে কিন্তু বাড়ে না তার ওজন। রাতের শুরু থেকে কখন যে শেষ ভাগের রাত এসে দাঁড়ায় দু'জনেরই খেয়াল ছিল না সেই রাতে। একের পর এক কথা বসে যেমন শব্দ তৈরি হয়। তেমনি দু'জনেরই একের পর এক

মনের কথা বসে কখন যে রাতের শেষ ভাগের রাত দরজায় এসে কড়া নাড়ে ঠাহর করতে পারেনি দুজনের একজনও।ভোরের সূর্য যখন উঁকি দেয় জানলার ওপার থেকে তখন দুজনের মনে হয় একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তাও কেন জানিনা ক্লান্তি নামে না দু'জনের চোখে। কিন্তু পরের দিনের অফিসের দরুন একটু হলেও বিশ্রাম নেওয়া উচিত তাই ক্ষনিকের বিদায়।পরের দিন সকালটা একটু না অনেকটাই এলোমেলো কাটে দু'জনের। অনেকটা আনমনা। জিৎ সামাল দিয়ে নিতে পারলেও। মানি তেমনভাবে মানিয়ে নিতে পারে না দিনটা। সারাদিন অফিসের বসের কাছে সব কাজের জন্যই জোটে তিরস্কার। সন্ধ্যায় জিতের এসএমএস পাওয়ার পর সারাদিনের এই তিরস্কার এর জন্য মনে মনে জিৎকেই দায়ী করতে থাকে মানি। এসএমএসের কোনও উত্তর দেয় না মানি। দু-একদিন কথা প্রায় বন্ধ। কয়েকদিনের মধ্যেই অফিসের কাজের জন্য শহরের বাইরে যেতে হয়েছে জিৎকে। হঠাৎ তার মনে হয় কয়েকটা ছবি পাঠাই তার খুব প্রিয় মানুষটাকে। কিন্তু অপর দিক থেকে উত্তর আসে,"থাক না আমাকে পাঠিয়ে কী হবে।" এই কয়েকদিনের মধ্যেই মানি উপলব্ধি করতে থাকে। জিৎ হয়তো তাকে পছন্দ করে। নাহলে কেন একটা ছেলে বার বার তার খোঁজ

নেয়। তাঁকে জানায় সব কিছু একটু হলেও মানি চিন্তা করে তাকে নিয়ে, সে তার মাকেও জানায়ে জিতের বিষয়ে।

অনেক এসএমএসের উত্তর আসেনা বহু দিন।কয়েকদিন পর মনির জন্মদিন। কমন কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু সেলিব্রেশন। খুব প্রিয় এক রেস্তোরাঁয়। কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হতে থাকে দু'জনের সম্পর্ক। যে সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল বছরের প্রথমে নববর্ষে। তারই শেষ হয় পিকনিক দিয়ে। অনেক দায়িত্ব রান্নার ঠাকুর থেকে স্পট বুকিং। যেহেতু খুব কাছের বন্ধুদের তাই একটু বেশি দায়িত্বও ছিল। অপরদিকে তার প্রিয় মানুষ। যদি সম্পর্কটা আবার ঠিক করা যায়, আবার সেই আগের মত। অনেকটা ভয় কাজ করতে থাকে জিৎ এর মধ্যে। তার ভালো লাগার ব্যাপারটা শুনলে হয়ত সে আর কোনদিন তার সাথে সম্পর্কই রাখলো না, কথা বলা তো অনেক দূরের কথা। একপ্রকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় সে কোনদিন তাকে কিছু

বলবেই না যেমন বন্ধু আছে ঠিক তেমনই থাকবে। বলেনা কিছু জিনিসকে যদি তুমি সত্যিই মন থেকে চাও তাহলে সেটা তুমি পাবেই, এক অদৃশ্য ঈশ্বরের হাত সাহায্য করে তা পাওয়ার জন্য। পিকনিক মানেই একটু বেহিসাবি, আর এই বেহিসাবি হতে জিৎ বেশ ভালোই জানে। তখন টেবিল ভর্তি প্রিয় বন্ধু বান্ধব, আর তার সাথে ঠিক তার পাশে তার খুব প্রিয় মানুষ কিন্তু অজানা। এই পিকনিকটাই হয়তো জিতের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল এনে দিয়েছিল তার খুব প্রিয় মানুষকে তার কাছে। তার বন্ধু-বান্ধবরা জানতো জিৎ হয়তো কোনওদিনই মানিকে তার মনের কথা বলতে পারবে না, তাই জিতের অনেকটা আড়ালে অনেকটা আকার-ইঙ্গিতে জিৎ এর মনের কথাটা মানিকে বুঝিয়ে দেয় তার খুব প্রিয় বন্ধুরাই। সারাদিন একসাথে থাকা, একসাথে খাওয়াদাওয়া, সাথে একটু বেহিসেবি হিসেব। সব মিলিয়ে ভালোই কাটলো দিনটা। রাতে ফেরার সময় একটু এগিয়েও দিয়ে আসে জিৎ মানিকে। কিন্তু এইসব বিষয় থেকে অনেকটাই দূরে কিছুই জানত না জিৎ। পরের দিনের সকালটা জিতের কাছে অনেকটা অপ্রত্যাশিত। বিপুল পরিবর্তন মনির মধ্যে। অনেকটা খেয়াল রাখার প্রবণতা। অনেকটা যেন জিতের মনের খুব কাছাকাছি মানি। কিন্তু ভাগ্য বলে একটা বস্তু আছে না, যা সুপ্রসন্ন না থাকলে হয়তো অনেক কিছুই করা সম্ভব নয়।তেমনই এক ঘটনা। দু একদিন পরেই মানি বলতে শুরু করে বাড়ি থেকে আমার জন্য ছেলে দেখছে, বিয়েটা এবার করতেই হবে। অনেকটা যেন আকাশ ভেঙে পড়ে জিৎ এর মাথায়। তাও নিজেকে

সামলে নিয়ে বলতে শুরু করে জিৎ, বাহ খুব ভালো করে ফেলো। কিন্তু কিছুতেই যেন নিজের মনকে বুঝিয়ে উঠতে পারে না। তাহলে আবারও কি সে হেরে গেলো? কথা বলতে বলতে কথাটা কেমন এক পর্যায়ে চলে এসে জিৎ প্রশ্নই করে ফেলে তুমি কি কাউকে ভালোবাসো মানি??

মানির উত্তর আসে, না। জিৎ আবার প্রশ্ন করে তুমি কি জানো তোমাকে কি কেউ ভালোবাসে?? কিছুটা চুপ করে মানি উত্তর দেয়, হ্যাঁ জানি, একজন আমাকে খুব ভালোবাসে। বুকের বাঁ দিকটা যেন ফেটে যাচ্ছে জিৎ এর। শহরে খুব ঠান্ডা পড়েছে, তাও যেন শিরদাঁড়া দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে জিতের। তাও নিজেকে চেপে রেখে আবার প্রশ্ন করে জিৎ, কে গো জানতে পারি?? অনেকক্ষণ বাদে উত্তর আসে "তুমি।"

অনেকটা অপ্রত্যাশিত ছিলো এই উত্তরে জিতের কাছে, আচমকা এমন উত্তরের একটু হতচকিত বলবো না, কী করবে বুঝে উঠতে পারেনি জিৎ।

শরীরের ভিতরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো জিৎ র।এতটাই যখন জানতে তাহলে এতদিন বলোনি কেনো।

ভেবেছিলাম তুমি হয়তো বলবে,তুমি না বলাতে অবশেষে আমি বললাম। এর প্রতি উত্তরে জিৎ মানিকে একটা প্রশ্ন করে।

"আমি তোমার সাথে আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি আমার সাথে বুড়ো হবে বৃষ্টি, আমার সুখ দুঃখের ভালোবাসার সঙ্গী হবে?"

সেদিন আর এসএমএসে ও নয়, সরাসরি ফোনে উত্তরটা আসে "হ্যাঁ আমি তোমার সঙ্গী হতে চাই।"

সপ্তাহের শেষে রবিবার দুজনের দেখা হয়,খুব প্রিয় সেই রেস্তোরাঁয়।

যে প্রেমটা শুরু হয়েছিল এক নববর্ষ, তা পূর্ণতা পেল অন্য এক নববর্ষে।

শুভ নববর্ষ মানি।

শুভ নববর্ষ খুব প্রিয় বন্ধুরা।

***

বাঙালীর খেলাধুলো : বিশ্বজয়ের মিহির উদয়

সুনন্দ সান্যাল

ভারতের যে কোনক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে যদি মিহির সেন নামটা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন, এর জন্য কাউকে দোষারোপ করা সঠিক নয় কারণ এই মিহির সেন নামটাকে বিস্মৃতির এতটাই পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যে অনেকেই এই নামটির সঙ্গে পরিচিত নয়। ভারত তথা বিশ্ববিখ্যাত অন্যতম দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতারু পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও নেহেরু পুরস্কারপ্রাপ্ত মিহির সেন, যিনি প্রথম ভারতীয় সাঁতারু ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে ৩২ কিলোমিটারের ইংলিশ চ্যানেল ১৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিটে অতিক্রম করেছিলেন এবং ১৯৬৬ সালে এক বছরের মধ্যে পাঁচটি মহাদেশে সাঁতার কাটার কৃতিত্বের অধিকারী পৃথিবীর একমাত্র মানুষ মিহির সেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার কৃতিত্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল যে বিষয়টি নিয়ে আমেরিকার খেলোয়াড়রা ও ক্রীড়াপ্রেমীরা অহংকার করতো সেই অহংকার ভঙ্গ করে দিয়েছিলেন মিহির সেন, যে ব্যক্তিত্বকে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড "World's Greatest Long Distance Swimmer" এই তকমা দিয়ে সম্মান জানিয়েছে।

Mihir-Sen-worlds-first-man-to-swim-across-the-Strait-of-Dardanelles-Be-An-Inspirer

৬ই এপ্রিল, মিহির সেন প্রথম ভারতীয় সাঁতারু, ১৯৬৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে "*পক স্ট্রেট*" ২২ কিলোমিটার জলপথ ২৫ ঘন্টা ৩৬ মিনিটে অতিক্রম করেন।

"পক্ স্ট্রেট" অতিক্রম করার পরেই ১৯৬৬ এই বছরেই "স্ট্রেট অফ জিব্রাল্টার" আগস্ট মাসের ২৪ তারিখে ১৩ কিলোমিটার জলপথ ৮ ঘন্টায় অতিক্রম করেছিলেন।

mihir-sen-first-asian-who-crossed-the-straits-of-gibraltar-be-an-inspirer

সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখে "*ডারদানেলেস স্ট্রেট*" স্বপ্নেও যে জলপথের কল্পনা পৃথিবীর কোন সাঁতারু করতে সাহস পেতেন না, সেই বিপদজনক জলপথ বিশ্বের প্রথম সাঁতারু মিহির সেন ১১ কিলোমিটারের জলপথ ১৪ ঘন্টায় অতিক্রম করেছিলেন।

"বসফরাস স্ট্রেট" সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখে ৭ কিলোমিটার জলপথ ৪ ঘন্টায় অতিক্রম করেছিলেন।

এবং সবশেষে

"পানামা কানাল স্ট্রেট" অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে ৩৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময় নিয়ে অতিক্রম করেছিলেন ৮২ কিলোমিটার জলপথ। ১৯৬৬ সালে একই বছরে এপ্রিল ৬ থেকে অক্টোবর ৩০ তারিখের মধ্যে পাঁচটি মহাদেশ জয়।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার মানভূমের দুর্দান্ত দামাল ছেলে, পশ্চিমবঙ্গের হিংসাত্মক ও অসুস্থ পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মা লীলাবতীর উদ্যোগে উড়িষ্যায় পড়াশোনা। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আইনে স্নাতক, সমুদ্রের ঢেউ জয় করার অসম্ভব জেদ ও চেষ্টা, চেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ, সাঁতার কাটার আধুনিকীকরণ জানতে যেতে হবে লন্ডনে, হতাশ মিহির সেনের পাশে এসে দাঁড়ান উড়িষ্যার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিজু পট্টনায়েক, সাঁতার এবং স্নাতকত্তোর পড়াশোনার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিজু পট্টনায়েক।

এক বছরের মধ্যে সাতটি সাগর অতিক্রম এর পিছনে বৃহৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই বক্তব্য মিহির সেন অকপটে স্বীকার করেছিলেন। সাধারণ বাড়ির অপ্রচলিত উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন এক জাতীয়তাবাদী যুবক তিনি বিশ্বকে বার্তা দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা প্রস্তুত বিশ্বব্যাপী যে কোন বিষয়ে অংশগ্রহণের জন্য। তরুণ ভারতীয়দের জন্য একটি সাহসিকতাপূর্ণ কৃতিত্বের উদাহরণ স্থাপন করার তাগিদে মিহির সেন জীবনের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ ভালো কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ভারতীয় তরুণ সমাজ তাঁকে দেখে প্রস্তুত হবেন।

মিহির সেন, সফল আইনজীবি, সফল সাঁতারু এবং অবশ্যই একজন সফলতম ব্যবসায়ী ছিলেন, মিহির সেনের বস্ত্র বিপণী সংসথা ভারতের ২য় বৃহত্তম সিল্ক রফতানি সংস্থার তকমা অর্জন করে। ছোটবেলার দুর্দান্ত দামাল ছেলে বয়সকালেও মেজাজী পুরুষ ছিলেন। ১৯৭৭ সালে বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসু যখন মিহির সেনকে বামফ্রন্টের হয়ে ভোটপ্রচারের অনুরোধ করেছিলেন তখন তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শুধু তাই নয় তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে নির্বাচনে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। দিল্লি ও উড়িষ্যার বহু রাজনৈতিক দল যখন মিহির সেনকে সমর্থনের ইচ্ছাপ্রকাশ করে তখনও তিনি একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন।

"নির্নিমেষ, ন্যাকামো, অতি আবেগপ্রবণ, অসৎ কাজকর্মে লিপ্ত, হীনমন্যতায় আক্রান্ত কোন মানুষের শরীরে বাঙালী রক্ত বইতে পারে না। বাঙালী মানে মেরুদন্ড সোজা, সবসময় মাথা উঁচু করে চোখে চোখ রেখে যুক্তি তর্ক ও সুস্থ কাজের মাধ্যমে অধিকার ছিনিয়ে নেবে।" - মিহির সেন

***

মনের মাকড়সা

অগ্নিমিতা দাস

ঋতম্ভরা সোফায় বসে আরাম করে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছে। এত কাজের চাপ! সময়ে পেয়ে একটু রিল্যাক্স মুডে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে সোফায় বসে কোমরটাকে বিশ্রাম দিচ্ছে। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত সমাজসেবী এবং মনোবিদ ঋতম্ভরা রায়কে। তসরের শাড়ি, হাল্কা প্রসাধন, কানে গলায় ডায়মন্ডের গয়নায় ব্যাক্তিত্বের ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সাক্ষাৎকারে ও কফির কাপে চুমুক দিয়ে সামনে বসা মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

_ ঋতম্ভরা নামটা তো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এত কাজ করার অনুপ্রেরণা পান কোথা থেকে? সম্প্রতি জার্মানির একটা জার্নালে "আপনার প্রবন্ধ" কুসংস্কারের বেড়াজালে ভারতীয় নারী" চারিদিকে সাড়া ফেলে দিয়েছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে কষ্ট হয় না, এত বৈভব আরাম ছেড়ে। হাতে কলমে না কাজ না করে ও তো অনেকে অনেক কিছু করেন বা বলেন।

ঋতম্ভরা সামান্য হেসে বলে উঠলো_ আমার স্বামী বীরেন রায় নামকরা সায়েন্টিস্ট, বেশিরভাগ সময়ই বিদেশে থাকে। ছেলে ডাক্তার, কানাডায় থাকে। কিন্তু হাতেকলমে কাজ না করে ফাঁকি দিতে আমি নারাজ। আসলে কি জানো। আমার আদি বাড়ি ছিলো বাংলাদেশের ময়মনসিংহে, সেখানে আমরা একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি। আমার ঠাকুমা ছিলো আমার প্রেরণা। আমার বাবা নামকরা ব্যারিস্টার, তখনকার দিনে মেয়েদের প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ঠাকুমা নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিধবা ভাইঝির বিয়ে দিয়েছিলেন, সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে ঘরের ও পাড়ার মেয়েদের বিকেলে পড়াতে বসতেন। নিজে ঘরে বসে বসেই প্রচুর লেখাপড়া করতেন। ঠাকুমা আমায় বলতেন_ ঋতু তুই যেভাবেই হোক আমাদের গ্রাম বাংলার অসহায় মেয়েদের রক্ষা করার চেষ্টা করিস। কুসংস্কার মাকড়শার জালের মতো মানুষের মনে জাল বিছিয়ে দেয়।সেই থেকেই মনস্তাত্ত্বিক হয়ে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে মেয়েদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করি।

"কুসংস্কার " একটা ব্যাধি,একে বোধহয় মনের মাটিতে একেবারের জন্য পুঁতে না দিলে আর চারাগাছ বেরোবে না। এখনো ভাবতে পারবে না কতো মেয়েকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়। আমি তো, আমাদের বাড়িতেই টুক করে আওয়াজ হলো লাভলি এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় কোন সুগন্ধি তেল মেখেছে বোধহয় গন্ধে মৌ মৌ করছে। ঋতমার পায়ের কাছে বসে হাঁ করে ঋতমার সাক্ষাৎকার দেখতে লাগলো। এই লাভলিকে দাইঘাটা গ্রামের মোড়লের নির্দেশে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল ডাইনি সন্দেহে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, এমনকি কোলের ছেলে যখন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মারা গেল, তখন সবাই কানাঘুষা করছিলো। গ্রামে পরপর কয়েকটা বাচ্চা মারা যেতেই সবাই মিলে ওকে ডাইনি সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারতে যাবে তখনই পুলিশের সাথে ঋতভরার প্রতিষ্ঠানের লোকজন হাজির হয়। লাভলিকে ঋতমা নিজের ঘরে রেখে দেয়। ঋতমাকে দেখাশোনা করে, আউটহাউসে থাকে। খুব ভালো মেয়ে, পরিচ্ছন্ন, শান্ত। সবাই ধন্য ধন্য করে শুধু বাইরে এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেই ক্ষান্ত হন নি ঘরের ও এইসব মেয়েদের ঠাঁই দিয়েছেন।

আর্টটার মধ্যেই ঋতমা ডিনার সেরে বাগানে একটু হাঁটে। বীরেন সাতদিন হলো বাড়িতে নেই, কনফারেন্সে গেছে।অন্যদিন কাজের চাপে কিছু ভাবার সুযোগ থাকে না। আজ একটু একা একা লাগছে। বাগানের হাসনুহেনা ফুলের গন্ধ মনকে আরো উদাস করে দিচ্ছে।

আকাশের এক ফালি চাঁদ যেন মুখ ভেংচিয়ে রয়েছে। হঠাৎ ঋতমা থমকে গেলো। আউটহাউস থেকে ভেসে আসছে গুনগুন করে গানের সুর। কি সুর , কি ভাষা ঋতমা জানে না। কিন্তু এই সুরকে সে ভয় পায়। প্রথমবার যেদিন লাভলি এই গানটা গুনগুনিয়ে ছিলো, কাঁচের ফুলদানিটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে ঋতমার পা ফালাফালা হয়ে গিয়েছিলো। একবার বারান্দায় শীতের দুপুরে গাছে জল দিতে দিতে সে এই গানটা করেছিলো। বেশ একটা ছন্দ আছে, সুর আছে ঋতমা ও ঘরে বসে ল্যাপটপে কাজ করতে করতে শুনেছিলো, ভালো লাগছিলো। রাতেই বীরেনের মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক। তখন ও কিছু মনে হয় নি। কিন্তু ছেলে আসার পর হুহু করে কাটছিলো। বাবু যে দুপুরে বলেছিলো_ লাভলিদি কি সুন্দর একটা গান গায় মা, ডাস্টিং করতে করতে গাইছিলো। ওকে গানের ক্লাসে তো ভর্তি করে দিতে পারো। গলায় সুর আছে। সেই রাতেই বাবুর গাড়ির এ্যাকসিডেন্ট হয়, গলার কলার বোন ভেঙে বেশ কিছুদিন কাবু। সেই থেকে ঋতমার

খটকা লাগে। লাভলি গান গাইলেই বাড়িতে বিপদ হয়। বীরেন বাড়ি নেই। আচমকাই অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো। গানের সুরটা ভেসে আসছে। ঋতমার মনে হচ্ছে এই সুরটা বুঝি ওর গলাকে পেঁচিয়ে ধরে সাপের মতো গিলতে আসছে। চিৎকার করে লাভলিকে গান থামানোর কথা বলতে গিয়েও পারলো না, একটা নিশাচর পাখির কর্কশ শব্দে ওর গলার শব্দ ডুবে গেলো।

***

চিত্রশিল্পীঃ অপলা মিত্র

বই কুটির কলকাতা

ভারতবর্ষে মুঘলদের শাসনকালে বাংলার জনজীবনে তাহাদের প্রভাব

রবীন মুখার্জি

ভারতবর্ষে মুসলিম সুলতানদের অনুপ্রবেশ ঘটে ছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে আর দিল্লির সুলতানদের সাথে বাংলার সংযুক্তি হয় ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু দিল্লির সুলতানদের আধিপত্য যখন বাংলার উপর থেকে ক্রমশ কমতে থাকলো, সেইসময় মুঘলরা বাংলাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। কিন্তু এই সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছিল মুঘল সম্রাট আকবরের শাসন কালে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলা তথা পূর্ব ভারতের সঙ্গে দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্যের সংযুক্তির এই বিলম্বের ও অনেক কারণ ছিল,

আমরা সবাই জানি যে সুলতান বাবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবর্ষের দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে নিজের বিদ্রোহীদের শাসন ও দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই সময় যথার্থ সুযোগ গ্রহণ করে বাবর সুদূর তুর্কেমেনিস্তান থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লির মসনদ দখল করেন। বাবর জাতিতে ছিলেন তুর্কি। বাবরের স্বপ্ন ছিল বাংলা তথা পূর্ব ভারত দখল করা কারণ সেই সময় পূর্ব ভারত ছিল বিশাল সমৃদ্ধশালী অঞ্চল। কিন্তু বাবর পূর্ব ভারত দখল নিতে পারেননি, কারণ তখন এই অঞ্চলে আফগানরা প্রবল শক্তিশালী ছিলেন।

পরবর্তীকালে বাবর এর মৃত্যুর পর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে তার পুত্র সম্রাট হুমায়ুন পূর্ব ভারত দখলের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় বিহারের সাসারামের সুলতান আফগান বীর শেরশাহ সুরির কাছে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাটল অব চৌসাতে পরাজিত হন। এর ফলে তাকে কেবল পূর্ব ভারত নয় দিল্লির মসনদ ও ছেড়ে আফগানিস্তানের কাবুলে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

দীর্ঘ ১৬ বছর আফগানিস্থানে থাকার পর শের শাহ সুরির আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করে তার উত্তরসূরী কে পরাজিত ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন। তাহার পর তার সুযোগ্য পুত্র আকবর এর শাসনকালে বাংলা সম্পূর্ণরূপে দিল্লি সঙ্গে সংযুক্তি ঘটেছিল।

মুঘল শাসন কালে বাংলা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কি গোটা পৃথিবীর কাছে এক সমৃদ্ধশালি অঞ্চল। মুঘলদের সময় রাজ কোষাগারের সমগ্র আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ আয় হতো বাংলা থেকে, যার উৎস ছিল মূলত কৃষি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, সিল্ক ও সুতির বস্ত্র শিল্প। এমনকি গোটা বিশ্বের বারো শতাংশ আয় হতো কেবলমাত্র বাংলা থেকে।

বাংলার উপরে মুঘলদের শাসনকাল কায়েম ছিল ১৫৭৬ - ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আকবরের সময়কাল থেকেই আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) পরে আরো দুটো দশক।

মুঘলদের আমলে সুবেদারদের মাধ্যমে দিল্লি সুলতানরা বাংলা কে শাসন করতো, তাদের সময় ঢাকা ছিল পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক রাজধানী। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল।

এখনো ঢাকা শহরে বিভিন্ন মন্দিরে, উদ্যানে, প্রাসাদে ও বিভিন্ন মসজিদে মুঘলদের স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সুলতান আকবরের সেনাধ্যক্ষ মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হয়েছিলেন। যিনি একমাত্র হিন্দু সুবেদার ছিলেন এবং সুলতান আকবরের নবরত্ন এর মধ্যে অন্যতম রত্ন ছিলেন।

মুঘলদের শাসনকালে বাংলার তথা পূর্বাঞ্চল এক বিশেষ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। এই সময় বাংলার কৃষি কার্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। কৃষকেরা ধান চাষের সঙ্গে নানা প্রকার অর্থকারী ফসল হিসেবে মালবেরি অর্থাৎ তুঁত চাষ শুরু করেছিল, এবং এর ফলে রেশম শিল্প থেকে অভাবনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হতো। বাংলার প্রায় আশি হাজার তাঁতি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বাংলায় মসলীন বিশ্ব তথা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো, সেই সময় বাংলাকে বিশ্বের রেশম শিল্পের প্রধান স্থান হিসেবে বিবেচিত করা হত।

মুঘলদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর বিভিন্ন ফসলের কৃষি কার্যের সময় ও ফসল সংগ্রহের সুবিধার জন্য ক্যালেন্ডার সৃষ্টি করেছিলেন। যাহার দিনলিপির ও মাসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবও পালিত হতো।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা তোডরমল প্রথম জমি জরিপ করা এবং ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ চালু করেছিলেন। এর ফলে বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলে কৃষি কার্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল।

কৃষিকর্ম ও তাঁতশিল্প ছাড়াও লৌহ আকরিক ও জাহাজ শিল্পের ব্যাপক উন্নতিও এই বাংলায় ঘটেছিল মুঘলদের আমলে। মুঘলদের সময় বাংলা শিক্ষা, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। যাহার নিদর্শন হিসেবে আজও দুই বাংলার বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ এইসব স্থাপত্য কলার কাজ দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলার খাদ্য সম্ভারে মুঘলদের বিভিন্ন রান্নার পদ বিশেষত আমিষ খাদ্যের পদ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তাদের সময় বিরিয়ানি, কাবাব, রেজালা, হালিম ও কোর্মা জাতীয় খাবার বাংলার ধনী সম্প্রদায়ের রন্ধনশালায় প্রবেশ করেছিল।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের পোশাক-আষাক ও বেশভূষায় মুঘলদের প্রভাব ঘটেছিল ষোলো, সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে। বিশেষত সিল্ক, ভেলভেট ও ব্রোকেট জাতীয় পোশাকের চল ব্যাপকভাবে সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সে যুগে দেখা যেত।

পুরুষদের পোষাকের মধ্যে পাজামা ও পাগড়ীর খুব চল ছিল এবং নারীর পোষাকে সালোয়ার, চুরিদার, ঘাগড়া ও ফারসীর ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। নারীরা অলংকার হিসেবে নাকছবি, নেকলেস, বালা ও কোমর বন্ধনী ব্যবহার করে নিজেদের সুন্দর করে তুলতো।

মুঘলদের সময় ভারতবর্ষের তথা বাংলার শিক্ষারও অনেক বিস্তার ঘটে ছিল। সরকারি দপ্তরে শিক্ষিত লোকদের নিযুক্ত করা হতো। সরকারি কাজে সাধারণত পার্শিয়ান ভাষায় ব্যবহার করা হতো, সেই কালে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী বেশিরভাগ মানুষ ফারসি ভাষা জানতেন। ফারসি ভাষায় জানা দপ্তরী

বাবুকে বলা হতো 'মুন্সি'। মুঘলদের শাসনকালে বিশেষত সম্রাট আকবরের আমলে সমাজের শিক্ষক, কবি, ডাক্তার ও বিভিন্ন পেশার গুণী ব্যক্তিদের সমাদর ছিল।

সুলতান আকবর শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সেই যুগে পার্শিয়ান কবি শেখ সিদ্দি খুবই জনপ্রিয় কবি ছিলেন।

তদানিন্তন বহুল প্রচলিত ফারসি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটে ছিল। বহুল প্রচলিত অনেক বাংলা শব্দের উৎপত্তি ঘটে ছিল এই ফরাসি শব্দ থেকে, যাহা আজ আমরা বাংলা অভিধানেতে দেখতে পাই। যেমন- জানলা, দরজা, ছিটকিনি ইত্যাদি।

বৈষ্ণবপদাবলীও তৈরি হয়েছিল অনেকটা ফারসীয়ানদের অনুকরনে। বিখ্যাত সাহিত্যিক ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সাহিত্যের মধ্যে আমরা ফার্শিয়ান সাহিত্যের ছোঁয়া পাই। বাংলার বাউল গান ও মহরমের দুঃখের গানও তৈরি শুরু হয়েছিল এই মুঘলদের আমল থেকে। ঔরঙ্গজেবের সময় ছাড়া অধিকাংশ মুঘল সুলতানদের আমলে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা নিজেদের ধর্মাচার সুন্দরভাবে পালন করতে পারতো এবং সেই সময় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল।

তবে ইসলাম ধর্মের সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অনেক মানুষজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে আকৃষ্ট করেছিল। কারণ সেই সময় কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জাতপাতের অত্যাচারে অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই ইতিহাস কে ফিরে দেখলে এবং সঠিকভাবে মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাই মোঘলরা ভারতবর্ষকে ভালোবেসে নিজেদের এই দেশের সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করে ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলার জীবনে কৃষ্টি, সংস্কৃত, কৃষি, শিল্প, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছিল। যদিও বর্তমানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল আমাদের এই সমাজ জীবনে ধর্মের নামে নোংরা রাজনৈতিক চক্রান্তের বীজ বপন করে তাহা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কু-প্রচেষ্টা চালানোর চেষ্টা করে চলেছে। এবং সুপরিকল্পিতভাবে মুঘলদের তৈরি স্থাপত্য ও বিভিন্ন কীর্তি কলাকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে বর্তমান সমাজ জীবন থেকে মুছে দেওয়ার গভীর এক চক্রান্তের খেলা খেলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মকান্ড

চলিতেছে যদিও এই অপচেষ্টা কোনভাবেই সফল হতে পারবে না, কারণ আমরা ভারতবাসীরা বিশেষত বাংলার সকল মানুষ জানেন যে ভারতবর্ষ এক বহুভাষী ও বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ এবং প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের সঙ্গে থেকে এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেছে , কারণ আমরা ভারতবাসীরা জানি আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা মধ্যেই ছড়িয়ে আছে বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য। যাহা কোনদিনও কোন অশুভ শক্তির দ্বারা এই জাতপাত, ধর্ম ও ধর্মের নামে এই নোংরা খেলা দিয়ে এই মহান দেশের অখন্ডতা কে খন্ডন করা যাবে না এবং এই মহান দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একে শক্ত হাতে প্রতিহতো করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

***

চিত্রশিল্পীঃ রিয়া ভট্টাচার্য

পয়লা-র প্রবর্তক

সীমন্ত রায়

সাধারণ অর্থে নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ মানে আমরা বুঝি বাংলা ক্যালেন্ডারের পয়লা তারিখ শুরু। ছেলেবেলা থেকেই এই দিনটি আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয় ছিল। দোকানে দোকানে ঘুরে কোলড্রিংস বা শরবত খাওয়া এবং ক্যালেন্ডার ও মিষ্টির প্যাকেট বোঝাই করে বাড়ি ফেরা। এসব তো গেল রীতি-রেওয়াজের কথা, কিন্তু ইংরেজির জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চের মতো বাংলা ক্যালেন্ডারেও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,আষাঢ় থেকে শুরু করে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র অবধি বারোটি মাস রয়েছে এবং এই বাংলা ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি কোথা থেকে, তা কি আমরা জানি? চলুন তবে সেই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝা যাক।

পয়লা বৈশাখ কে বাংলা নববর্ষ হিসেবে পালনের ধারা বেশি দিনের পুরনো নয়। হিন্দু সৌর পঞ্জিকা অনুসারে বাংলার বারোটি মাস অনেক আগে থেকেই পালিত হত। এই সৌর পঞ্জিকা শুরু হতো খ্রৈস্তীয় পঞ্জিকা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। হিন্দু সৌর বছরের প্রথম দিন আসাম, বঙ্গ, কেরল, মনিপুর, পাঞ্জাব, ওড়িশা, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পালিত হতো। এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত হয়, একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, একসময় তেমনটা ছিলনা। তখন বাংলা শুভ নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হতো। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু না হওয়ায় কৃষকদের ঋতুর ওপরই নির্ভর করতে হত। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করত, কিন্তু হিজরীর সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলিত না তাই অসময়ে কৃষকদের খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হত। খাজনা আদায় পরিচ্ছন্নতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।

তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। এই বিষয়ে নানা ঐতিহাসিকরা নানান মত দিয়েছেন, তবে সম্রাট আকবরই বাংলা সনের প্রবর্তক তা অনেকেই মেনে নিয়েছেন।

আবুল ফজল-র "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থের ইলাহিতে "অব্দ" সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ ফতেউল্লাহ সিরাজী সৌর সন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম তৈরি করেন। ১৫৮৪ খিষ্টাব্দে ১০ই বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর ১৫৫৬ সাল থেকে আবার অনেক গবেষকদের মতে ১৪ই এপ্রিল সম্রাট আকবরের রাজ্যাভিষেক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এই দিনটিকে নতুন সালের প্রথম দিন ধার্য করা হয়। একটা সময় অগ্রাহন বা অঘ্রান মাস কে মাঘ শীর্ষ বা প্রথম মাসে বলা হত। ওই মাসেই অনুষ্ঠিত হতো গ্রাম বাংলার সবচেয়ে আনন্দের উৎসব নবান্ন। তবে পয়লা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয় আকবরের সময়কাল থেকেই কিন্তু তখন প্রত্যেক চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা পরিশোধ করতে হত কৃষকদের।

***

প্রেম এসেছিল নীরবে

সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

ডাঃ হিমাংশু রায় চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন কিন্তু নিজের পেশা থেকে একদিনের জন্যও মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। তাই, গ্রামে ফিরে গরীব, দীন-দুঃখিদের সেবার্থে একটি নার্সিংহোম খুলেছেন। ভাইপো রমাকান্তকে একটি ওষুধের দোকান করে দিয়েছেন ; - বেকার ছেলেটারও হিল্লে হয়েছে। কাকা-ভাইপো মিলে রুগীদের সেবা করছেন। ডাক্তারবাবু, ফি নামমাত্র নেন। ওষুধের মূল্যও তুলনামূলকভাবে এখানে কম, দশ-বারোটা গ্রামের কাছাকাছি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। সুতরাং, এখানে রুগীদের ভীড় খুব হয়। ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সব সামলাচ্ছেন। রুগীদের কাছে ডাঃ হিমাংশু রায় ভগবান।

সকালবেলা; ডাঃ হিমাংশু রায় তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়ায় চড়ে সবুজ, শ্যামলে অমলে ভরা বন-প্রান্তর, জলাভূমির মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছিলেন। এই অভ্যাসটি বরাবরের। শৈশবে, মানু জমিদার প্রতাপ চন্দ্র রায়ের কোলে চড়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। সেই শখটি তাঁকে পেয়ে বসে। পরবর্তীকালে, লক্ষণডইরীতে থাকাকালীন দূর-দুরান্তে ঘোড়ায় চড়ে রুগী দেখতে যেতেন। লক্ষণডইরী জায়গাটি ছিল পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট একটি আদিবাসীদের গাঁ। আশে-পাশের গ্রামগুলিও ছিল আদিবাসী, মুসলিম প্রধান গ্রাম। গাড়ি-ঘোড়া চলতো কম। ডাক্তারবাবুর এই সাদা ঘোড়াটিই প্রাণপ্রিয় ছিল। একমাত্র ভরসা। তো যা বলছিলাম, আজ যখন ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চড়ে বন-প্রান্তর, জলাভূমির মধ্য দিয়ে ছুটছিলেন; – এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চোখ আটকে গেল। ঘোড়া দাঁড় করিয়ে দেখছিলেন বিমুগ্ধ চিত্তে, একজন জটাধারী বৃদ্ধা রমণী একটা কেউটে সাপের সামনে খুব জটা নাচিয়ে নাচছেন। সাপটা স্থির দৃষ্টিতে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্য দেখে ডাক্তারবাবুর একজনকে খুব করে মনে পড়ে গেল – সে হচ্ছে বাসুমাতারী। কিন্তু, এ্যাদ্দিনবাদে সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক পরিবেশে ওকে হঠাৎ করে দেখতে পাওয়া এক মীরাকেল ব্যাপার। এই জটাধারী মহিলা বাস্তবেই বাসুমাতারী কিনা দেখতে, ডাক্তারবাবু ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে, ভালো করে পরখ করে শনাক্ত করলেন। এই মহিলা প্রকৃতই বাসুমাতারী। সেই নাক, সেই চোখ-

মুখ অবয়ব। সে ব্যতীত কার এমন দুঃসাহস আছে, এমন করে বিষধর সাপের সামনে দাঁড়ায়? ডাক্তারবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, "বাসুমাতারী তুমি আমার কাছে চলে এসো শিগ্‌গির – সাপটা তোমায় কামড়ে দেবে।" বাসুমাতারী পিছন ঘুরে দেখলো ডাক্তারবাবুকে একবার। তারপর কটমট করে চেয়ে বলল "তু কে আছিস বোটে হামার নাম ধরে ডাকিনছিস? হামার লাচের ব্যাঘাত ঘটানবি তো, অভিশাপ দিব-- যা ইখান থেকে" - বাসুমাতারী আক্রোশে তর্জনী নির্দেশ করলো। ডাক্তারবাবুর এগিয়ে গিয়ে একটি পাথরের টুকরো সজোরে সাপটির পানে ছুড়ে দিলেন। সাপটি আহত হয়ে নড়বড় করতে করতে খেতের সবুজ ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বাসুমাতারী চিৎকার করে উঠলো আক্রোশে "তু হামার দুশমন আছিস তুকে অভিশাপ দিচ্ছি" - ডাক্তারবাবু হাতের ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে গেলেন এর পাড়ে বললেন: "বাসুমাতারী তুমি আমাকে চিনতে পারছ? আমি তোমাদের বড় ডাক্তারবাবু আছি গো। তোমার ছেলে মঙ্গল, নাতি বীরসা আমাকে কত ভালোবাসত আর তুমি আমাকে অভিশাপ দেবে বলছো?"

বাসুমাতারী ডাক্তারবাবুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ তারপর নেত্র বিস্ফারিত করে, বললো : "তু ঝুট বোলতা হ্যায় – তু, ঝুটা বলছিস্। হামার বেটা মঙ্গল মর্ গয়া। মর গয়া। তু হামার বেটাকে দেখা, বোল?" সে ধমকিয়ে উঠলে ডাক্তারবাবু বললেন : "হ্যাঁ, আমি তোমার ব্যাটা মঙ্গলকে দেখেছি। তুমি দেখবে?"

-"হ্যাঁ হামি জরুর দেখভো হামার বেটাকো।"

- তবে এসো আমার সঙ্গে।

বাসুমাতারী মাথার জটা নেড়ে বললো : "চল তব।"

ডাক্তারবাবু ওকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে, নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী রমাদেবী বাসুমাতারীকে দেখতে নার্সিং হোমে এসেছেন। তাঁকেও সে চিনতে পারেনি। রমাদেবী অনেক প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে নিরাশ করেছে।

ডাক্তারবাবু শহরের বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কুনাল চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠিয়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি ডাঃ হিমাংশু রায়ের বিশেষ বন্ধু। রমাদেবী বীরসাকে সংবাদ পাঠাতে বলছিলেন। বীরসা বাসুমাতারীর নাতি। ডাঃ হিমাংশু চান, বাসুমাতারী একটু সুস্থ হোক আগে, তারপর বাড়িতে খবর পাঠাবে।

বাসুমাতারীর ছেলে মঙ্গল বামপন্থী নেতা ছিল। তাকে মাওবাদীরা হত্যা করে। পুত্রশোকে বেচারি বাসুমাতারী পাগল হয়ে গেছে। এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল। ডাক্তারবাবু ওকে উদ্ধার করেছেন। তিনি বাসুমাতারীর পরিবারের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ। ডাঃ হিমাংশু রায় লক্ষণডহরীতে থাকতে, মঙ্গল এবং ওর ছেলে বীরসা খুব সাহায্য করতো। সর্বক্ষণ তাঁদের সেবা করেছে। সেসব দিনের কথা সহজে কি ভোলা যায়?

ডাঃ কুনাল চক্রবর্তী বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে এসেছেন। হিমাংশুবাবু তাকে বাসুমাতারীর বেডের সামনে নিয়ে গেলেন। ওর বিশাল জটা দেখে ডাঃ কুনাল চক্রবর্তী রেগে গিয়ে, সামনে দণ্ডায়মান দুইজন নার্সকে বললেন : আপনারা এক্ষুণি রুগীর জটা কেটে ফেলুন। মাথায় বোঝা নিয়ে, উনি তো এমনিতেই অসুস্থ হয়ে উঠবেন। নার্স দুইজন এগিয়ে গিয়ে, বাসুমাতারীর জটা খুলে দিয়ে কিভাবে কাটবে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ সে ক্ষিপ্রগতিতে নার্স দুইজনকে ধাক্কা দিল। এঁরা ছিটকে পড়লেন, মেঝের উপর। হিমাংশু বাবু মিচকি হেসে বললেন: "সর্বনাশ! ওর জটায় হাত দিলে রক্ষা নেই কারো। এক কাজ করো কুনাল, জটা কাটতে হবে, বাসুমাতারীকে অচেতন করতে হবে, তাছাড়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।"

ডাঃ কুনাল বললেন: "ঠিক আছে দেখছি" উনি ব্যাগ থেকে একটি লাল রং-এর ট্যাবলেট বের করে নার্সদের হাতে দিয়ে বললেন: "এটি খাইয়ে দিন ওকে। উনি অচেতন হয়ে পড়লে, জটা কেটে ফেলুন। তারপর পেশেন্টের চিকিৎসা শুরু হবে। চলুন দাদা, ততক্ষণ একটু চা সেবন করি।"

- "হ্যাঁ ভাই, তাই চলো।" ডাঃ হিমাংশু রায় তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের চেম্বারে প্রবেশ করলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে, ডাক্তারবাবুরা যখন ফিরে এলেন; দেখলেন, নীলপাড় শুভ্র বসনে - চকচকে টাক মাথা বাসুমাতারী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ডাঃ হিমাংশু রায় ইতিমধ্যে পেশেন্টের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। ডাঃ কুনাল

চক্রবর্তী বাসুমাতারীকে দেখে খুশি হয়ে বললেন: "শুভ। দাদা আপনি চিন্তা করবেন না, আমি খুব শীঘ্র একে সুস্থ করে তুলব। প্রথম ধাপে আমি কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি, নিয়ম করে বাসুমাতারীকে খাওয়াবে। দ্বিতীয় ধাপে হলকা ইলেকট্রিক শক প্রয়োগ করব এবং শেষ চেষ্টা অন্যভাবে করব। সে সময় হলে বলে দেব। আপাততঃ আমি কিছু মেডিসিন লিখে দিচ্ছি। ওকে নিয়মিত খাওয়াতে হবে।" ডাঃ কুনাল চক্রবর্তী খচখচ করে প্রেসক্রিপশান লিখে ডাঃ হিমাংশু রায়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

."তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ভাই।" ডাঃ হিমাংশু রায় বললেন।

— "দাদা, আমাকে এত ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। এই ওষুধগুলো পেশেন্ট খাক্, পরে একদিন আবার এসে দেখে যাব।" ডাঃ কুনাল চক্রবর্তী বিদায় নিলেন।

রমা দেবীর তর সইছিলো না। উনি বাসুমাতারীর কথা মেয়েকে জানাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। করুণা এখন কৃষ্ণনগরের একটি স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যেই ডজন কয়েক শিক্ষিকা একসঙ্গে থাকেন। সুতরাং, করুণা খুব প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ি আসে না। সে যাতায়াতের ধকল সহ্য করতে পারে না। ওর জন্য খুব উদ্বিগ্ন থাকেন রমাদেবী। প্রত্যহ ফোনালাপ করেন। আজকে করুণাকে ফোনে ধরেই উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, – "জানিস করুণা, আজ ক'দিন হলো আমাদের এখানে একজন নতুন অতিথি এসে জুটেছে" –

-"কে মা?"

— "বাসুমাতারীকে তোর মনে আছে।"

– কি যে বলো; ওকে মনে থাকবে না। বীরসার ঠাম্মাকে ভুলতে পারি। সে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল।

"হ্যাঁ, সে এখানে সেখানে ঘুরতে ফিরতে আমাদের এখানে এসে পৌঁচেছে তোর বাবা একদিন দেখি ঘোড়ায় চড়িয়ে ওকে বাড়িতে নিয়ে এলো –

"তারপর? তারপর কী হলো।" করুণা রীতিমতো আত্মহারা হয়ে উঠেছিল বাসুমাতারীর কথা শুনে। রমাদেবী ধমকে বললেন আর বলতে পারবো না। তুমি নিজের চোখে দেখে যাও। বাসুমাতারীর জটা কেটে,

নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। তুমি এই সংবাদটা বীরসাদের বাড়িতে দিতে পারবে? ওদের কারো কন্ট্যাক্ট নম্বর তোমার জানা। আছে?"

মা, তোমাকেও একটি শুভ সংবাদ দিই। বিরসা এখন পুলিশ অফিসার হয়েছে। এই কৃষ্ণনগর থানার ও.সি। ও না থাকলে আমার যা হয়েছিল" - করুণা ডিউ কেটে চুপ করে যায়। রমাদেবী বিগলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন – "তোর কি হয়েছিল মা? চুপ করে গেলি কেন? কী হয়েছিল।"

"কিছু নয় মা। সামান্য একটি ঘটনা। তুমি পরে শুনে নিও।"

– "কি হয়েছিল? বল এক্ষুণি; নইলে আমার মরা মুখ দেখবি" -

-ওহ। মা তুমি না আমাকে বলিয়েই ছাড়বে দেখছি। শোনো তবে। কয়েকজন মাতাল আমাদের স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকে মদ খাচ্ছিল। আমি ওদের বাধা দিয়েছিলাম এবং সামান্য ঝামেলা হয়েছিল। বীরসা এসে ওদের অ্যারেস্ট করেছিল। কেসটা চলছে। তুমি এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। বীরসা তো এখানে রয়েছে, চিন্তার কী আছে?"

– "এত বড়ো ঘটনা ঘটে গেল, তুই আমাদের জানাসনি মা? তোর কিছু হয়ে গেলে, আমি কি নিয়ে বাঁচব বলতে পারিস?" রমাদেবীর দু' চোখ জলে ভরে উঠলো নিমেষে। আঁচলে মুছে পুনরায় বললেন : "বীরসার ফোন নাম্বারটা আমাকে এক্ষুণি দে, আমিই ওকে ফোন করে বাসুমাতারীর কথা জানাব।"

— "থাক্, তার প্রয়োজন নেই। আমি রবিবার বীরসাকে সঙ্গে নিয়েই গ্রামে ফিরছি। চিন্তা করো না মা।"

ফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রমাদেবী হ্যালো, হ্যালো করেও কোনো প্রত্যুত্তর পেলেন না।

কথায় আছে, গোয়ালের গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। রমাদেবী কথাটি শোনার পর বিচলিত, ব্যথিত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। কেননা; রমাদেবীর বড় মেয়ে শ্রুতিকে হারিয়েছিলেন এই মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে। লক্ষণডহরিতে থাকবার সময়, তাঁদের বাসার সামনে কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছিল। ওদের শ্রুতি বারণ করেছিলো, বাসার সামনে মদ খেতে। মাতাল ছোকরাগুলো মা-মেয়েকে গালাগালি দেয়। তখন বীরসার বাবা মঙ্গলকে ডাকা হয়েছিল। মঙ্গল মাতালগুলোকে আচ্ছাসে পিটাই দিয়েছিল। ওদের মধ্যে

মজিদ নামের একটি ছেলে দলবল নিয়ে শ্রুতির উপর চড়াও হয়। তাকে তুলে নিয়ে যায় শয়তানগুলো। শ্রুতিকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। ডাক্তারবাবু নিজের মেয়েকে বাঁচাতে পারেননি। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছিলো। শ্রুতির মৃত্যু তাদের সুখীজীবনকে তছনছ করেছিল। ডাক্তারবাবু লক্ষণডইরীতে থাকতে সাহস করেননি। মঙ্গলকেও ওরা হত্যা করে সুতরাং, ডাঃ হিমাংশু রায় সপরিবারে লক্ষণডইরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই করুণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখে, রমাদেবী বড় উতলা হয়ে উঠেছিলেন। অনেকদিন পরে, আজ খুব কাঁদলেন হাউমাউ করে।

করুণা বাসুমাতারীর সংবাদ দিতে ছুটে গেছিলো বীরসার পুলিশ কোয়ার্টারে। সে তখন স্নান করছিলো বাথরুমে। কাজের মাসি চা দিয়ে গেল আর বলে গেল – "আপনি বসেন দিদিমণি। উনি ডিউটিতে যাবেন তাই তৈরি হচ্ছেন।"

করুণা বাধ্য হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। সামনের সেল্ফে পুরনো কিছু বই-এর মধ্য থেকে একটি ডায়েরী টেনে নিয়ে ও পড়ছিলো। দেখলো, বীরসার লেখা হস্তাক্ষর। করুণা চমকে উঠলো। ডায়েরীর একটি পাতা পড়তে গিয়ে বীরসা লিখেছে ..."প্রেম আমার জীবনেও এসেছিল একবার; – বসন্তের কোকিলের মত গলাপের সুগন্ধি বাতাস নিয়ে। আমার মনে সে আগুন জ্বালিয়ে ছিল কিন্তু আমার অক্ষমতা নিয়ে আমি সেই আগুনে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হয়েছি। ঘৃণ পোকাগুলো আমার মনকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আমার অশান্ত মনকে শান্ত রাখতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছি। আমার অক্ষমতা হলো, আমি সামান্য একজন গরিব সাঁওতাল যুবক। আমার প্রেমিকা রাজনন্দিনী। আগুনে হাত বাড়ালে হাত পুড়ে যেতে পারে। আমার তাই সাহস হয়নি।"

করুণার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠোঁটের কোণে গোপন হাসি লুকিয়ে, যথাস্থানে ডায়েরীটাকে রেখে দিল। বাইরে বীরসার গলা শোনা গেল।

– "মাসি করুণাকে চা দিয়েছ তো"

– "হ্যাঁ বাবা, উনাকে চা দিয়েছি।" কাজের মাসি প্রত্যুত্তরে বললো। বীরসা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করলো। করুণাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন করলো: "কি ব্যাপার, তুমি? কোনো প্রবলেম হয়নি তো?"

করুণা মৃদু হেসে বললো, "পুলিশের কাছে আমি এখন আসিনি মহাশয়! আমি এসেছি – আমার প্রিয় বন্ধুর বাড়িতে।"

বীরসা হেসে বললো: "তাই বুঝি!! ম্যাডামের স্কুল নেই?"

—"না আজ যাবো না। গ্রামের বাড়ি যাব ভাবছি।"

– "হঠাৎ করে গ্রামের বাড়ি?"

– "সঙ্গে তোমাকেও নিয়ে যাব মহাশয়। একটি সুখবর শুনলে, না গিয়ে থাকতে পারবে না।"

– "কি সুখবর শুনি? তোমার বিয়ে নাকি!।" ওরা দু'জনেই হেসে উঠলো হো-হো করে।

করুণা একটু গম্ভীর হয়ে বললো: "তোমার ঠাকমাকে পাওয়া গেছে। উনি বাবার নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। কুনাল আঙ্কেল তাঁর চিকিৎসা করছেন।"

"সত্যি। বাঃ আমাকে তুমি চিন্তা মুক্ত করলে। তবে তো তোমার সঙ্গে যেতেই হয়। ঠিক আছে তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি থানা থেকে আসছি। তুমি এখানে দুপুরে খেয়ে নিও। তারপর দু'জনে রওনা দেব ক্ষণ।"

করুণা সম্মতি জানিয়ে বললো, "ঠিক আছে, তুমি এসো। বীরসা প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়ে, দ্রুত প্রস্থান করলো।

বিকেল গড়িয়ে ওরা সেনপাড়া পৌঁছালো। করুণার সঙ্গে বীরসাকে দেখে ডাক্তারবাবু ও রমাদেবী খুব খুশি হলেন। ডাঃ হিমাংশু রায় ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন: "-কি রে বীরসা, তুই আমাদের একদম ভুলে গেছিলি তাইনা? তুই তো এখন বড় পুলিশ অফিসার হয়েছিস শুনলাম। বাঃ। খবরটা করুণার কাছে শুনে খুব খুশি হয়েছি বাবা। আমাদের আশীর্বাদ সবসময় তোর সঙ্গে থাকবে। যেখানেই থাক, ভালো থাকিস বাবা।" বীরসা ওঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো:—"কাকাবাবু ভুল বুঝবেন না। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে

থেকেও সবসময় আপনাদের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু, সময়াভাবে এতদিন দেখা করতে পারিনি। এখন আর কোনো ভুল হবে না। এবার থেকে যোগাযোগ থাকবে।" রমাদেবী এগিয়ে এসে বীরসার মাথায় হাত রাখলেন; বললেন, "তুই ছিলি বলে আমার করুণার কিছু হয়নি। ওকে এবার থেকে একটু দেখে-শুনে রাখিস বাবা।" রমাদেবীর চোখের কোণে অশ্রু ডগমগ করছিলো। বীরসা বললো: "আমি আছি, কাকিমা একদম চিন্তা করবেন না।"

– "চিন্তা করবো না বললেও কি হয় বাবা, চিন্তা এসে ধরে। এই একটিই তো আমার মেয়ে। বাড়ি থেকে দূরে থাকে।"

রমাদেবীকে চুপ করিয়ে দিয়ে করুণা বললো:- "বীরসা তুমি ঠাকমাকে দেখতে যাবেনা? চলো তাঁকে দেখে আসি।"

– "হ্যাঁ, তাই চলো।" বীরসা বললো।

ডাক্তারবাবু বললেন : "আয়, আমিও যাচ্ছি।" উনি লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবু ওদের বাসুমাতীরীর বেডের পাশে নিয়ে এলেন। বীরসা অবাক নয়নে চেয়েছিল ওর ঠাকমার পানে। সাদা শাড়ি নীল পাড় বস্ত্রটি পরে, হাঁটু মুড়ে চুপচাপ বসে ছিল বাসুমাতীরী। সেই বিশাল জট নেই, ন্যাড়ামাথা ঠাকমাকে দেখে, বীরসা ও করুণা মিচকি হেসে উঠলো। বীরসা প্রশ্ন করলো, "কেমন আছো ঠাক্মা?"

বাসুমাতীরী ওদের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল।

বীরসা পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই, সে হাত নেড়ে বললো: "যা যা হিয়াসে যা। হামকো ছুবিনা। মেরা জটকাটা তুম লোগ – কিসিকো ছোড়েগা না। আনে দে মেরা বেটা মঙ্গলকো।" কথাটি শুনে বীরসাও মুষড়ে পড়লো। অনেকদিন পরেও ঠাক্মা ওর বাবার নামটা এখনও স্মরণে রেখেছে, ভুলতে পারেনি। পুত্রশোকে সে পাগল

হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই পরম বন্ধু, একজন জননীর হৃদয়ে গাঁথা আছে পুত্রের নামটি। মৃত্যুর পূর্বে তাকে কিছুতেই ভোলানো যাবেনা - যায় না।

অনেকক্ষণ ধরে বীরসা ঠাকমার সঙ্গে কথা বলছিল। সে বিরক্ত হচ্ছিল, ওদের সহ্য করতে পারছিল না। অগত্যা দুঃখী মনে বীরসা ডাক্তারবাবুকে বললেন : কাকাবাবু একটা কাজ করলে হয়না? ঠাকমাকে লক্ষণডহরি নিয়ে গেলে হয়তো তাঁর অনেক কথাই মনে পড়ে যেতে পারে। একবার চেষ্টা করলে হয়না কাকাবাবু?"

-"... হুম, অসম্ভব কিছু নেই। স্মৃতি ফিরে এলেও আসতে পারে। কুনালকে এ ব্যাপারে বলে দেখি কি বলে? ওর সঙ্গে আলোচনা করে দেখছি। বাসুমাতারীর কাজ-কর্ম, এর পরিচিত গন্ডির পরিসরে বর্ণময়জীবন নিশ্চয় কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। কুনালকে আমি বোঝাব। সে রাজি হলে, আমরা সবাই লক্ষণডহরিতে যাবো।" প্রত্যুত্তরে ডাক্তারবাবু নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন। শুনে, বীরসা মনে, মনে আনন্দিত হলো....

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুনাল চক্রবর্তীকে রাজি করানো গেছে। ওঁরা সবাই মিলে দুটো গাড়িতে লক্ষণডহরির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। পাঁচ/ছয় ঘণ্টার রাস্তা। মুর্শিদাবাদ জেলার শেষ প্রান্ত। বিহার রাজ্যের শুরু। এখানকার সব লোকজনদের আজব ধরণের কথা-বার্তা, চাল-চলন। বাঙ্গালি-বিহারী একে অপরের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে দিয়েছে যেন। বাংলা আর বিহারের ভোজপুরী এবং আধা হিন্দী: আদিবাসীদের সাঁওতালী ভাষা সব মিলে-মিশে একাকার। সুতরাং যার যেমন ভালো লাগে বলে। শান্ত এলাকাটা বর্তমানে রাজনীতির ছোঁয়ায় অশান্ত হয়ে উঠেছে। তবুও ধীরসার গ্রাম লক্ষণডহরী সচেতন। বীরসা আদিবাসী লোকজনদের ট্রেনিং দিয়ে, অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। এই গ্রামে সবাই সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করে। সুতরাং, সহজে কেউ তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে না। ডাঃ হিমাংশুবাবুর বড় মেয়ে শ্রুতিকে হারানোর পর, ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে।

আজ বহুদিন পরে, ডাঃ হিমাংশু রায় লক্ষণডইরী যাচ্ছেন। পুরাতন স্মৃতিগুলো মনের মাঝে ভীড় করছে নিশ্চয়ই। সেই সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো মনে পড়তে বাধ্য। -

জীবনটা সত্যিই একটা রহস্যময় বস্তু। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। পুনরায় ডাঃ হিমাংশু রায়কে লক্ষণডইরীতে ভাগ্য নিয়ে এলো। যখন গাড়ি দুটো গ্রামের রাস্তা ধরে মন্থর গতিতে এসে, বীরসাদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো, গ্রামের আদিবাসী লোকগুলো উঁকি মারছিলো। ডাঃ হিমাংশুবাবুকে দেখে ওরা এগিয়ে এলো। ওদের চোখে-মুখে আনন্দের, খুশির আতিশয্য। ওরা সমস্বরে বলে উঠলো; "আরে। বড়ো ডাক্তারবাবু তু ইখেনে!! কেমুনটো আছিস্ বোর্টে? করুণা বিটিয়া, মেডাম তুরা সোবাই এসেনছিস? বীরসা লিয়ে এসেনসে তাই লাকিগা বড় ডাক্তারবাবু" ..... একসঙ্গে কত প্রশ্ন। গ্রামের গরিব আদিবাসী মানুষগুলোর কাছে ডাঃ হিমাংশু রায় ও তাঁর পরিবার পরম প্রিয় ছিল একদিন; – আজও তেমনই আছেন। তারা সেই প্রমাণ পেলেন। গ্রামবাসীরা করজোড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছি হাসি মুখে। ডাঃ হিমাংশুবাবু, রমাদেবীর প্রতি নমস্কার জানালেন। তারা হাসিমুখে সবার সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বীরসা আর করুণা বাসুমাতারীকে ধরে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো। ডাঃ কুনাল চক্রবর্তী দুরে দাঁড়িয়ে, "অবাক, অবাক শুনির মত চেয়েছিলেন। ভাবছিলেন, আদিবাসী মানুষগুলো অশিক্ষিত, গরিব প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত তাই, হাতের নাগালে ভগবানকে স্বয়ং ওরা আজ পেয়ে গেছে। মুক্তমনে, হাসিমুখে প্রাণভরে কথা বলতে ব্যস্ত।

বীরসা এসে তাদের মুক্ত করলো। গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে, বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। ডাঃ হিমাংশুবাবু প্রশ্ন করলেন - "বীরসা তাদের বাড়িটা তো সেই আগের মত নেই। রে; - এ যেন রাজপ্রাসাদ।।"

বীরসা হেসে উত্তরে বললো : – "সবই আপনাদের আশীর্বাদের সুফল কাকাবাবু আঙ্গিনার একপাশে কালিমন্দিরটা চোখে পড়লো। ডাঃ হিমাংশুবাবু হেসে বললেন : "সব পরিবর্তন দেখছি কিন্তু বাসুমাতারীর মন্দিরটা সেই আগের মতই আছে দেখছি।" বীরসা বললো : "... হ্যাঁ কাকাবাবু, এটা ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গিনি। ঠাকমার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি।" – "বেশ করেছিস। এইটাই আমাদের এখন খুব কাজে লাগবে। প্ল্যানটি পরে বলবোক্ষণ।"...

দুই ডাক্তারবাবু মিলে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। বহুরূপী মুকেশ মুস্তফিকে কাজে লাগিয়েছেন। সে হুবহু বাসুমাতারীর অতীতের কর্মগুলো সুন্দরভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে। বীরসা সব শুনে খুব খুশিই। সুতরাং, কাজ শুরু হলো।

কালি মন্দিরের সামনে আঙ্গিনায় সারি সারি চেয়ার পাতা হলো বসবার জন্য। মন্দিরের বারান্দায় বহু গ্রামবাসীকে বসিয়ে দেওয়া হলো। বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে চেয়ার দখল করে বসলেন দুই ডাক্তারবাবু। বাসুমাতারী বীরসার পাশেই বসেছিল, তাকে সামলাবার জন্য। বহুরূপী মুকেশ জটাধারী বাবা সেজে কালিমায়ের পুজোয় ব্যস্ত। ওর গলায় সাপ ঝুলছে। ধূপ-ধুনোয় মন্দির চত্বর ধুম্রাচ্ছন্ন। ঢোলক বাজছে। করতাল বাজিয়ে, মুকেশ কালি মায়ের বন্দনা গাইছে; মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে - "জয় মা কালি, কোলকাত্তাবালি" বলে। নিখুঁত অভিনয়।

ঘণ্টাখানেক পুজো চলার পর, বাসুমাতারীর চোখ-মুখের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ডাঃ কুনাল চক্রবর্তী বীরসাকে চোখের ইশারায় সচেতন করলেন। হঠাৎ করে বাসুমাতারী চিৎকার করে উঠলেন : – "এই – এই তুরা কে আছিস রে? হামার মন্দির অপবিত্র করিনছিস – মঙ্গল, মঙ্গল বেটা দেখ তো?" কথা বলতে, বলতে সে চৈতন্য হারালো। বীরসা রেড়ি ছিলো; ঠাকমাকে জড়িয়ে ধরে, পাঁজাকোলে ঘরের দিকে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুও ছুটে গেলেন, ওর সঙ্গে। ঘরটাতে আত্মীয় স্বজনেরা ভীড় জমিয়েছিল। হিমাংশুবাবু বীরসাকে বললেন "এবার একটু নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশ চাই। তুই এবারে বাড়ি থেকে সবাইকে চলে যেতে বল।" বড় ডাক্তারবাবুর কথায় কি হয়ে গেল। ডাঃ কুনালবাবু বললেন "চিন্তার কিছু নেই। আমি একটা ইঞ্জেকশান.. উনি এখন ঘুমোক। সব স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।" তার কথায় সবাই স্বস্তি পেলেন। ডাঃ হিমাংশুবাবু হেসে বললেন: "জয় মা কালী।।"

সন্ধে গড়িয়ে প্রায় রাতের দিকে, বাসুমাতারীর জ্ঞান ফিরলো। চোখের সামনে দেখে, সে প্রশ্ন করলো: "আরে। বড়ো ডাক্তারবাবু হামাকে তু হসপাতালে ভর্তি করেনছিস ক্যানে?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন : "এটা হসপিটাল নয় - তোমাদের বাড়ি।"

-"তবে ই স্যালাইন লটকাছে ক্যানে?"

"তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে বলে এই ডাক্তারবাবু তোমাকে সুস্থ করে তুলেছেন। কথাটি বলে ডাঃ হিমাংশুবাবু ডাঃ কুনাল চক্রবর্তীকে নির্দেশ করলেন।

বাসুমাতৌরী বললো: "ইকে তো চিনতে পারলাম না। ছোটো ডাক্তারবাবু কুথায় বটেক?

-"তোমার জন্য ইনি শহর থেকে এসেছেন গো। যাক্ ও কথা, বলো এখন কেমন লাগছে? শরীর ভালো আছে তো?" ডাঃ হিমাংশুবাবু প্রশ্ন করলেন।

"হামার আবার কি হবে?" বলে বাসুমাতৌরী বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলো। ধীরসা ঠাকুমাকে ধরে পুনরায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললো – "এখন উঠবেনা একদম।তুমি বিশ্রাম করো। বাড়ির সবাই এখনই এসে পড়বে।"

ওরা কথা বলছিল, এমন সময় বাড়ির লোকজনেরা হুড়মুড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। ওদের তর সইছিলো না যেন। ছোটো ছেলে অবদেশ, বৌমা মুনিয়া ওদের ছেলে রাজু। বীরসার মা নয়নতারা। বাসুমাতৌরী সবাইকে দেখে খুব খুশি। সে হেসে প্রশ্ন করলো: "মেরা রাজু কাহা?" ছোটো বৌমা মুনিয়া প্রত্যুত্তরে বললো: "মাম্মী রাজু তো আপকে সামনেই খাড়া হ্যায়" –

—"কাহা?" রাজু মাথা ঝুঁকিয়ে বললো: – "দাদি তু ক্যায়সা হ্যায়?"

বাসুমাতৌরী ওকে দেখে খুশিতে জড়িয়ে ধরে শির চুম্বন করে বললো: "আরে বদমায়েশ তু ইতনা বড়া হো গয়া।।" ওর কথা শুনে ঘরের উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলো....

পরের দিন। ডাক্তারবাবুর। সবাই ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। করুণা মাকে বললো: "মা, তোমরা ফিরে যাও, আমি বীরসার সঙ্গে কৃষ্ণনগরে ফিরে যাব।" রমাদেবী রেগে উঠলেন ;

—"সে কি করে হয়। বাড়িতে দু'দিন থাকবি না?-

"আমি তো নিজের বাড়িতেই এসেছি মা।"

– "কী বলছো তুমি, মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না।"

কথাটি শুনে সবাই অবাক হলেন।

করুনা হেসে বললো, "আমার জন্ম এখানে। বড় হয়েছি এখানে তখন এটা আমার মাদার ল্যান্ড নয়?"
ডাঃ হিমাংশুবাবু হেসে বললেন : "হ্যা, করুণা তো ঠিকই বলেছে করুণ বীরসাকে চোখের ইঙ্গিতে বললো : "বাবা এবার ঠিক বুঝেছেন।"

সবাই যখন তৈরি হয়ে গাড়িতে চড়ে বসেছেন; করুণা আর বীরসাকে চোখের সামনে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদের ফোনের সুইচ অফ। রমাদেবী খুব রাগ করছিলেন ডাঃ হিমাংশু রায় বললেন, "ওদের ছাড়ো, পরে ধীরে সুস্থে আসবে। আমরা এগোই - বরং। বীরসা সঙ্গে আছে, চিন্তা কী?" গাড়ি দু'টো লক্ষণভইরা ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। ওরা তখন মনের আনন্দে দু'জনে হাত ধরাধরি করে মুক্ত বিহঙ্গের মত সমস্ত বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে, বন-জঙ্গল পদদলিত করে ছুটছিলো – ছুটছিলো আর ছুটছিলো---

***

চিত্রশিল্পীঃ রিয়া ভট্টাচার্য

বারো মাসে তেরো পার্বন

-প্রদীপ রায়

হুজুগে বাঙালি, রসিক প্রিয় বাঙালি, উল্লাসে উন্মাদনায় মেতে ওঠা বাঙালি - সারা বছরই ব্যস্ত থাকে কোনও না কোনও বিষয়ে। কোনও না কোনও মাসের পার্বনে নিজেকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে ফাটিয়ে চুটিয়ে বিন্দাসে উদ্ভাসিত করে মিলিয়ে জুলিয়ে সবাইকে একসাথে করে আনন্দের আবেগে ভেসে যেতে সদা প্রস্তুত।

সারা বছর ধরে এমনভাবে পার্বনগুলো ঠিক করা আছে যাতে তোমার মন মেতে থাকবেই থাকবে।

আসলে উৎসবে আছে অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য্য। স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। দুঃখসুখের মিলনসেতু। সব মালিন্য মুছে যায়। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে অন্তরে উদ্ভাসিত হয় কল্যানসূচক শুভ কামনা।

উৎসব শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে সমারোহ, আমোদ, আড়ম্বর, অনুষ্ঠান, সমাবেশ ইত্যাদি সব জাঁকজমক শব্দ। উৎসব তাই একা হয়না। উৎসবে থাকতে হয় হরেক রকম মানুষ, যারা নেচে গেয়ে, হইচই করে উৎসবকে করে তোলে প্রাণবন্ত। সেই অর্থে উৎসব সবার। কিন্তু আর্থ সামাজিক অবস্থা ভেদে আমরা খুবই দুঃখজনকভাবে উৎসবগুলোকে সবার করে তুলতে পারিনা। এর মাঝে ব্যতিক্রম হল ধর্মীয় উৎসবগুলো। স্বাভাবিকভাবেই যে দেশে যে ধর্মের মানুষের বেশি বাস করে সে দেশে সেই ধর্মের উৎসব হয়ে ওঠে সার্বজনীন।

কথায় আছে "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার"।

বছরের শুরু। পয়লা বৈশাখ। নতুনখাতা। নতুন ক্যালেন্ডার। মিষ্টি বিতরণ। নবান্ন উৎসব।

বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম সামাজিক উৎসব । সকল বাঙলির কাছেই এটাই প্রিয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব। পহেলা বৈশাখে বাঙালি বহুযুগ ধরে বর্ণাঢ্য আচার

আনুষ্ঠানিকতায় বর্ষবরণ উৎসব উদযাপন করে থাকে। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন "এতো ভঙ্গ বঙ্গদেশে, তবু রঙ্গে ভরা।"

ব্যাপারটা যদি এইভাবে দেখা যায় এর পিছনে লুকিয়ে আছে নানা ব্যঞ্জনযুক্ত আহ্লাদিত খাবার সেটা এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত হয়েছে।

মোদ্দাকথা পেটুক বাঙালি খেতে চায়। সব ইচ্ছে তো একসাথে মেটানো যায়না। তাই ভুড়ে দাও উৎসব। "সরুচকলি-পিঠে-ভাজা পিঠে-আসকে-দুধপুলি"। এগুলো খেতে গেলে পৌষ মাস চাই। চাই। পৌষ সংক্রান্তি না এলে জমে না। খাবার ইচ্ছেও জাগে না। এই যে প্রবৃত্তি, উন্মাদনা, অভিলাষ এগুলো আপনা থেকেই জেগে ওঠে। চাগিয়ে তোলে। হিড়িক ওঠে আর লোভাতুর বাঙালির জিভগুলো স্বাদ নেওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

এর একটা উদাহরণ দিলে সোজাসাপ্টা বুঝতে পারবেন যেমন আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হল। ভালো-মন্দ খাবার নিশ্চয়ই থাকবে? থাকবেই।আপনার মনটা, আপনার জিভটা, আপনার উন্মাদনা কীসের প্রত্যাশা করে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিনি পয়সার ভোজ গল্প তার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাওয়া-প্রত্যাশার পারদ কোন পর্যায়ে যেতে পারে। সেটা খুঁজে পাওয়া যায়।

অক্ষয় বাবু যখন নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে চন্দ্রকান্তের কাছে জানতে পারে বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনতে গিয়েছে:

"কী বললি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গিয়েছেন? বলিস কী রে! আজ তবে তো রীতিমত খানা! খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন-চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের টুথিকাঠির মতো চকচকে করে রেখে দেব। একটা মুরগির কারি অবিশ্যি থাকবে— কিন্তু, কতক্ষণই বা থাকবে! আর দু-রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা হলে চেঁচেপুঁচে চিনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে করে ডজন-দুতিন অয়স্টার প্যাটি আনে তা হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধ হয় অয়স্টার প্যাটি আসবে"

তাহলে ভাবুন স্যাহিত্য রসিক, খাদ্য রসিক ভোজন পিপাসু

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন?

যতদিন পৃথিবীতে সাহিত্য থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন আমাদের অন্তরে।

এই ধরুন ধর্মীয় উৎসব:-মহরম, বড়দিন, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, ইতু, বিহু, অন্নপূর্ণা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা, শীতলা, মা চণ্ডী, শবেবরাত, ঈদ-দল-ফেতর, ছট -আরও কত যে আছে মনে পড়ছে না। বাংলা জমজমাট হয়ে ওঠে। হইহুল্লোড়।নতুন জামা কাপড়। ভাব বিনিময়। গতানুগতিক বাঙালির জীবনকে প্রানবন্ত করে তোলে।

আর এর পিছনেই আছে নানান আহ্লাদিত খাবার।মনোহরণ করা খাবার। বৈচিত্রময় খাবার।

ঈদ মানেই উৎসব। আর এই উৎসবের প্রধান উপকরণ খাওয়া-দাওয়া। প্রচুর খাওয়া- দাওয়া। প্রধান খাবারের সাথে থাকে নানারকম মিষ্টি

সেমাই, মানতি, সানজি, কেটুপাট :খট মট লাগছে শব্দগুলো। কিন্তু ভালো জিনিস। প্রাণ টানে।

তারপর ধরুন ঋতু উৎসব। নানান রং। বিবিধ ঢং।নবান্ন, বসন্ত, শারদীয়া, নববর্ষ, বর্ষবরণ ইত্যাদি। ওখানেও খুঁজে দেখুন। একই গন্ধ। একই উন্মাদনা।

***

রঙ্গিনীর তুর্কিনাচন

দিব্যেন্দু ঘোষ

এমন জংলি দুয়ার, এমন ময়ূরনীল আকাশ, এমন কালচে সবুজ জঙ্গল, এমন সিঁদুরের গোল টিপের মতো সূর্য, এমন করে বদলে যেতে থাকা পশ্চিম আকাশের রং, এমন অচেনা জাফরানি রং মিশে ময়ূরনীল রঙে ভাঙন, এমন হলুদ সরিয়ে মিষ্টি ম্যাজেন্টার তোষামোদ, এমন ঘন পাইন গাছের আড়াল, এমন রডোডেনড্রনের উঁকি, এমন সবুজের মাথা ছুঁয়ে মেঘের ভেসে যাওয়া, এমন পাহাড়ি পাকদণ্ডীর নীরবতা ভেঙে কয়েক হাজার ঘণ্টাধ্বনির মতো একসঙ্গে ঝিঁঝিঁর ডেকে চলা। তারই মাঝে সারি সারি তাঁবু। একটু একটু করে সূর্যের পাটে বসা আর ক্ষীণ পায়ে সন্ধে নামার উপলক্ষ্য ওই তাঁবুর বুক চিরে বানানো জানলায় চোখ মেলতেই আরও জাঁকিয়ে বসে।

তূর্ণা, পুষ্পালি, তুর্কি আর পলাশ। ওরা প্রত্যেকেই সাংবাদিক। তুর্কি আর পলাশের বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে। তূর্ণা আর পুষ্পালি জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমে মাস্টার্স কমপ্লিট করে দুটো ছোট মিডিয়া হাউসে ঢুকে পড়েছে। তূর্ণা অ্যাঙ্কর, পুষ্পালি সিনিয়ার প্রোডিউসার। রবীন্দ্রভারতীতে জার্নালিজমের স্পেশাল ক্লাস নিতে যেত তুর্কি। সেখানেই তূর্ণার সঙ্গে আলাপ, সখ্য। পলাশ আর পুষ্পালির আলাপ অবশ্য ফেসবুকে। ওদের চতুষ্কোণিক বন্ধুত্বটা অবশ্য ট্রেকিংয়ের দৌলতে। চারজনের কমন বিষয় ট্রেকিং। কতবার যে ডুয়ার্স গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে চারজন একসঙ্গে এই প্রথম।

ডুয়ার্সের বাগরাকোট থেকে সোজা উত্তর দিকে ঢুকে গেলে জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা শেষ আর দার্জিলিং জেলার শুরু। সামরিক ছাউনিকে পাশে রেখে পাহাড়ি পথে পাঁচ কিলোমিটার ভিতরে গেলেই অনেকটা খাড়া পথে উঠে পৌঁছে যাওয়া যায় চুইখিম। আরও একটু এগোলে অ্যালব্যাং। কাছেই পাহাড়ি নদী রমতি ঝোরা। খুব কাছেই সুন্দর একটা ঝর্না। পর্যটন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা

অনেকেই মনে করেন, ডুয়ার্সে এখনও অন্তত একশোটি স্পট খুঁজে বার করা যাবে যেখানে ভ্রমণ-পিপাসু মানুষের পা পড়েনি। চুইখিম ও অ্যালব্যং যেন তেমনই দুটি পাহাড়ি জনপদ।

অ্যালব্যংয়ের তাঁবুর ভেতর আলগোছে শুয়ে ওরা রাত নামা দেখছে, আকাশের গায়ে আঁধারের খেলা দেখছে। পাহাড়-জঙ্গলের আপন নীরবতায় মন সেঁকে নিচ্ছে। তবে প্রায় গায়ে গা লাগানো দুটো তাঁবুর ভেতর জুড়ি বদলে গেছে। একটা তাঁবুতে পাশাপাশি বসে তুর্কি আর পুষ্পালি, অন্যটাতে পলাশ আর তুর্ণা। তুর্কির মাথা থেকেই বেরিয়েছে আইডিয়াটা। সবার যে সায় ছিল, তা নয়। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে ওদের বন্ধুত্বের রংটাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কতবার তো এখানে এসেছিস, ডুয়ার্স নামটা কোথা থেকে এসেছে, জানিস?

পুষ্পালির প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল তুর্কি। এই প্রথম পুষ্পালিকে বড্ড কাছ থেকে দেখছে তুর্কি।

ওই শয়তান ছেলে, অমন কামুক দৃষ্টিতে কী দেখছিস আমার দিকে? তুর্ণাকে ডাকব?

ধুর, তুই না বড্ড বেরসিক। তুর্ণাকে ডাকার কী হল? পলাশ যে তুর্ণার মুখের দিকে এমন করে তাকিয়ে নেই, তা কি তুই দেখতে যাচ্ছিস?

এটা তো ভুল বলেনি তুর্কি। হঠাৎ উঠতে যাচ্ছিল পুষ্পালি। ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল তুর্কি। বল দেখি, ডুয়ার্স নামটা কী করে হল?

'দুয়ার' শব্দটা ইংরেজদের মুখে 'ডুয়ার্স' হয়ে গেছে। কিন্তু 'দুয়ার' কেন? আসলে সমভূমি থেকে উত্তরে পাহাড়পথে ভুটানে যাওয়ার জন্য ছিল আঠারোটা পথ বা দুয়ার। বহুবচনে দুয়ারগুচ্ছ। ইংরেজরা DOOARS বা ডুয়ার্স বেছে নেয়। হিন্দুস্তানি 'দ্বার' বা ইংরেজি DOOR থেকেই 'দুয়ার' শব্দটির উদ্ভব। আঠারোটা দুয়ার কী কী, জানিস? একটু আগেই তুর্কি যতটা মাতব্বর ছিল, এখন ততটাই কাগুজে বাঘ। তুর্কির জ্ঞানভৈরবী পার্ট যেতে বসেছে। বলে বলে গোল খাচ্ছে সাংবাদিকতায় বাচ্চা মেয়েটার কাছে।

ডালিমকোট, ময়নাগুড়ি বা ডুমেরকোট, চামুর্চি বা সামচি, লক্ষ্মী বা লাকরি, বকসা বা পাশাখা, ভলকা বা ভুলকা, বরা, গুমর, রিপো, চেরাং বা ছেরাং, বাগ বা ছোটা বিজনি, বুড়িগুমা, কালিং, শুরকোল্লা, বংসকা, চাপাঘোরি বা চাপাগুড়ি, চাপাঘামা, বিজনি। প্রথম এগারোটি জায়গা পূর্বে বেঙ্গল ডুয়ার্স (তিস্তা থেকে মানস পর্যন্ত) ও বাকি সাতটিকে (মানস থেকে ধানসিরি নদী পর্যন্ত। এই নদীটি অসমে এবং এই একই নামে অদ্ভুত সুন্দর একটি চা বাগানও আছে) বলা হত অসম ডুয়ার্স।

তুই এত কিছু জানলি কী করে, রে?

পড়েছি। সার্জন রেনির Bhotan And The Story of Dooars War। তুইও পড়, জানতে পারবি।

পুষ্পালি বলতে থাকে, এখন অবশ্য ডুয়ার্স বলতে তিস্তা থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত এলাকাকেই বোঝায়। ১৮৬৯-এর পয়লা জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হওয়ার পর ডুয়ার্সের বেশিরভাগ অংশই ছিল জলপাইগুড়ি জেলায়। ২০১৪-র পঁচিশে জুন জলপাইগুড়ি জেলা বিভক্ত হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা গঠিত হলে বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলাতেও ডুয়ার্সের অনেক অঞ্চল ঢুকে পড়েছে।

একবার গাঢ় অন্ধকারের দিকে, আরেকবার তাঁবুর ভেতর পুষ্পালির ঠোঁটের দিকে তাকায় তুর্কি। মেয়েটা কত পড়াশোনা করছে, জানছে। ভাল লাগছে তুর্কির। অধিকারবোধ জন্মাচ্ছে কি? এক মুহূর্তের জন্য তুর্ণার কথা ভুলে গিয়ে পুষ্পালির ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে দেয় তুর্কি। তুর্কির গালে সজোরে চড় মারল পুষ্পালি।

এটা তুই কী করলি, কেন করলি?

তুর্ণা আর তুই কি আলাদা?

মানে, কী বলতে চাস? পলাশ জানলে কতটা খারাপ ভাববে বল তো?

ধুর, ওকে দেখাগে যা। ও-ও হয়ত তুর্ণাকে চুমু খেয়ে ফেলেছে এতক্ষণে। আমি কি কিছু মনে করব? আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকলে হতেই পারে। এমন নির্জন নৈকট্য, এমন আবেগ-বাঁধা আঁধার, এমন মায়াবি জঙ্গল, এমন পাহাড়ি বৈভব, এর মাঝে এমন একটু হতেই পারে ডিয়ার।

আমরা আগুন-ঘি নই তুর্কি, আমাদের বন্ধুত্বটা শরীরের ঊর্ধ্বে।

প্লিজ, না রে, এটা তোর বস্তাপচা ধারণা। পলাশ কি কখনও তোকে চুমু খায়নি, বুকে হাত দেয়নি?

না। বেশ জোরের সঙ্গে বলল পুষ্পালি। তুই এই জন্যই আলাদা তাঁবুতে আকাশ দেখার বাহানা বানিয়েছিস, তাই না! ইসসসস, আমি কী বোকা!

না, তুই বোকা নয়। শোন, তুর্ণার সঙ্গে আমিও শুইনি। পেনিট্রেট করিনি। তবে, চুমু খেয়েছি, বুকে হাত দিয়েছি, স্তনবৃন্তে মুখ রেখেছি, নাভিতে জিভ দিয়েছি, ওর দুপায়ের মাঝেও হাত দিয়েছি। এতে আপত্তির কী আছে, ইয়ার! আমি জানি, ওর সঙ্গে সেক্স করতে চাইলেও ও বাধা দেবে না।

বাট, আমি দেব, তুর্কি। তাতে তুই যদি আমাকে ব্যাকডেটেড বলতে চাস, বলতে পারিস। যদি বন্ধুত্ব ভেঙে দিতে চাস, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। আই মিন, হোয়াট আই মিন।

তুর্কি-পুষ্পালির কথার মাঝে ওরা জানতেও পারল না, তখন তুর্ণার মাখনের মতো নরম, কবুতরের মতো সফেদ দুটি স্তনের ওপর পলাশের দুটো হাত স্থাপন করেছে তুর্ণা। তুর্ণা, তুর্কি বা পুষ্পালি যদি জানতে পারে, সর্বনাশ হবে, এটা ঠিক না। আমরা বন্ধু। বেড পার্টনার নই।

ধুর, বোকারাম, কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না। তুই শুধু বল, তোর ভাল লাগছে কি না! এই দ্যাখ, বলে বারমুডাটা খুলে ফেলল তুর্ণা। গমরঙা নাভি, বেশ ফর্সা কলাগাছের গুঁড়ির মতো দুটো উরুর মাঝে একফালি কালো প্যান্টি। পলাশ সত্যিই হাঁদারামের মতো তাকিয়ে। ওর বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। ঠিক তখনই পলাশকে টেনে ওর মাথাটা দুপায়ের মাঝে গুঁজে দিল তুর্ণা। ছটফট করতে থাকে পলাশ। নাহ্, এ অভিজ্ঞতা ওর কাছে একদম আনকোরা। কোনওদিন পুষ্পালির ঠোঁট পর্যন্ত ছোঁয়নি। স্তন বা নাভিমূলে হাত বা মুখ রাখা তো এখনও পলাশের সিলেবাসের বাইরে।

উফ, সাংবাদিকমশাই, সাদা পাতায় আপনার আঙুল যে জাদু দেখায়, এখন কোথায় গেল আপনার আঙুলের সেই জাদু? আমি ভিজছি, বুঝতে পারছিস না শালা। চুপ করে ন্যাদা মাছের মতো পড়ে আছিস কেন? তোর হাতের মুঠোয় এমন এক নারী শরীর, আর তুই সন্ন্যাসব্রত নিয়েছিস? পলাশ ছিটকে

সরে যাওয়ার আগেই ওর মুখ লক্ষ করে সপাটে লাথি চালাল তুর্ণা, শালা বাস্টার্ড, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। তুই পুরুষ নাকি হিজড়ে, দাঁড়ায় না তোর?

বারমুডা আর গেঞ্জিটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে তাঁবু খুলে বেরিয়ে এল তুর্ণা।

মাথার ওপর লাল চাঁদ, পায়ে ভেজা ঘাস, গায়ে ঝোপ-জঙ্গল, আগে-পিছে ছড়ানো টুকরো টুকরো দেশ। নর-নারীর আদিমতা যতই ফিকে হোক, রাতের পায়ে পায়ে বন্য প্রকৃতি তীব্র আদিমতায় নিজেকে মুড়ে ফেলছে। আরণ্যক ভাললাগা আর নির্জনতাকে আপন করার রোমাঞ্চ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। নগর যতই বিস্তার করুক আপন নিয়মে, যতই খুবলে নেওয়ার চেষ্টা করুক ডুয়ার্সের লাবণ্য, রহস্য, তবু ডুয়ার্স তার মানুষজন, গাছপালা, আকাশ, জল নিয়ে স্রষ্টার স্বপ্নমায়া প্রার্থনায় রত। নির্নিমেষ তাকিয়ে তুর্ণা। ঠোঁটে জীবনানন্দ,

এই পথ দিয়ে কেউ চলে যেত জানি।
এই ঘাস
নীলাকাশ—
এসব শালিখ সোনালি ধান নর-নারীদের
ছায়া কাটাকুটি কালো-রোদে।
.....
সে তার নিজের সাধ রৌদ্র স্বর্ণ সৃষ্টি করেছিল।
তবুও রাত্রির দিকে চোখ তার পড়েছিল ব'লে
হে আকাশ, হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হ'লে
যখন আমার মৃত্যু হবে

সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে এক নারীর

অবোলা রাত্রির মত চোখ মনে রবে।

হঠাৎ পাশের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল তুর্কি। তুর্ণাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। না রে, আনসাকসেসফুল। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়েছি কি ব্যস, টেনে চড় মারল পুষ্পালি।

বেশ করেছে, শালা, তুই গাড্ডু একটা। তুই না স্যাংবাদিক!

ভুলে যাস না, পুষ্পালিও তাই। তুই পেরেছিস পলাশকে রাস্তায় আনতে!

হ্যাঁ, বাট ওর দ্বারা হবে না।

মানে?

খুব সোজা, নারী শরীরে হাত দিলেও ওর দাঁড়ায় না। আমি শালা কী করব? চেষ্টা করলাম, শালা, মরা মাছের মতো পড়ে রইল।

আচ্ছা বাদ দে, পরে সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

কিন্তু, ঠিক সময়ে যদি সব কিছু ঠিক না হয়, বুঝতে পারছিস, অভিজিৎবাবুর সঙ্গে ডিলটার কী হবে?

আমাদের পারতেই হবে, তুর্ণা। এত টাকার ডিল, মিস করা চলবে না। একটু এদিক-ওদিক হলে আমরা এখান থেকে ফিরতে পারব না। অভিজিৎবাবু কেটে রমতি ঝোরায় ভাসিয়ে দেবে, কেউ টের পাবে না।

বাট ভুলে যাস না, অভিজিৎবাবু ব্যবসায়ী হতে পারে, পলিটিকাল কানেকশন থাকতে পারে, কিন্তু আমরাও স্যাংবাদিক। সেটা উনি জানেন। তাই ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

ওসব বাদ দে। তুই না বলেছিলি, বন্ধুত্বের টানে সব সম্ভব। এখন বুঝতে পারছি, ওরা দুজন নিজেদের কাছে খুব লয়্যাল। ওদের এই রাস্তায় আনা মোটেই সহজ হবে না, তুর্কি।

তুর্কির ওপর তোর বিশ্বাস নেই? দেখ না, কেমন তুর্কি নাচন নাচাব।

অ্যালব্যাংয়ে প্রায়ই দেখা মেলে ম্যাগপাই পাখির। ম্যাগপাই আকারে বেশ বড়। ডানার রঙ জেব্রার মতো, সাদা আর কালোয় মেশানো। এ ছাড়া কিট নামে একটি লুপ্তপ্রায় পাখিরও দেখা মেলে। তুর্ণা, আসার পথে ম্যাগপাই দেখেছিস?

না তো, বরং কিট দেখলাম মনে হল।

আমায় বললি না তো!

অ্যালব্যাংয়ে পাইনের মাথায় শহরে সম্পর্কগুলো অদ্ভুতভাবে দোল খাচ্ছে। এবারের ট্রেকটা আর পাঁচটা ট্রেকের থেকে আলাদা। এবার তুর্কি-তুর্ণার অন্য মিশন। যে মিশনে ভীষণভাবে সামিল করতে হবে পলাশ, পুষ্পালিকে। অভিজিৎ ঘোষালের অফারটা হেলাফেলার নয়। তুর্ণাকে জানাতে, ওর মনে কিছুটা সংশয় ছিল প্রথমে। পরে মেনে নেয়। কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অনেক কিছু ভাবতে থাকে তুর্ণা। তুর্কি বিভোর আনকোরা এক নেশায়। ওদিকে দুই আলাদা তাঁবুর ভেতর চুপটি করে বসে থাকে পলাশ আর পুষ্পালি। একসময় ওরাও বাইরে বেরিয়ে আসে। চারজন কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ওদের মনের মধ্যে ঠিক কী চলছে।

কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ব, পলাশ।

তুর্কির কথায় সায় দেয় পলাশ, কোনদিকটায় যাবি বল তো?

বক্সা পাহাড়ের ওপর ডুকপাদের গ্রামে।

দারুণ। সেবার তো যাওয়া হল না। এবার গেলে কালী মাইয়ের পুজো দেখা যাবে। বিদেশ থেকেও প্রচুর লোকজন আসে শুনি।

ঠিকই বলেছিস।

পুষ্পালি বই পড়তে ভালবাসে। সাংবাদিকতা করার সূত্রে শুধু চলতি খবরে গা ভাসানো নয়, দেশ-বিদেশের রূপকথা, উপকথায় ওর বিশেষ ইন্টারেস্ট। ট্রেকিংয়ে এলেও এক-আধটা বই ওর ট্র্যাভেলব্যাগে থাকে। এবার পুষ্পালি একটা মহাভারত বয়ে এনেছে। ট্রেনে করে আসার সময় সুযোগ পেলেই গাদাগোদা

সাইডের সেই বই পড়ে সময় কাটিয়েছে সে। তুর্কি কতবার বিরক্ত হয়ে বলেছে, মহাভারত তো আমাদের সকলেরই পড়া। এর কাহিনি মোটামুটি প্রায় সব লোকেরই মুখস্ত। কতবার পড়বি এক বই?

মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চম বেদ, জানিস তো, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় রচিত মহাকাব্যের মধ্যে মহাভারত শুধু বৃহত্তমই নয়, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম। পুষ্পালি হেসে বলেছে, মহাভারত কখনও পুরনো হয় না রে। যতবার পড়ি, নতুন লাগে।

আচ্ছা, তুই যে এত টুকে করিস, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি, চিলাপাতা তো গেছিস বহুবার। জানিস, সেখানকার ইতিহাস?

নাহ্, এ মেয়ের কাছে ড্রয়ার্স নিয়ে এবার সত্যিই হারতে হচ্ছে তুর্কিকে। তাতে ওর বিশেষ হেলদোল নেই। শুধু শেষ হাসিটা ওকে হাসতেই হবে।

পুষ্পালির প্রশ্নে আমতা আমতা করতে থাকে তুর্কি।

চল, তাঁবুতে চল, খেয়ে নিই। খিদে পাচ্ছে। পলাশের কথায় সবাই তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। একটা তাঁবুতেই ঢুকল ওরা। ড্রাই চিকেনের প্যাকেটগুলো বার করে ফেলল তুর্ণা। পুষ্পালি ওর ব্যাগ থেকে মিষ্টির প্যাকেটগুলো বার করল।

খেতে খেতে বলতে থাকে পুষ্পালি, কোচ রাজবংশের আদিপুরুষ বিশ্বসিংহের তৃতীয় পুত্র ছিলেন চিলা রায়। তিনি নাকি চিলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন শত্রুর ওপর। চিলাপাতার জঙ্গল নামটা তাঁর নাম থেকেই এসেছে। সেই চিলা রায় এই জঙ্গলে একটি দুর্গ স্থাপন করান। সেই দুর্গের নাম নলরাজার গড়।

এটা জানতাম।

তা হলে বলতে পারলি না কেন? হারবি, তবুও হার স্বীকার করবি না তুই।

মনে মনে বলতে থাকে তুর্কি, আমি হারব না। হারতে তোকে হবে।

খাওয়া শেষ করে ওরা শুয়ে পড়ল। এবার একটা তাঁবুতে পলাশ-পুষ্পালি, অন্যটাতে তুর্কি-তুর্ণা।

পাহাড়ের কোলে সূর্যটা সবে আড়মোড়া ভাঙছে। ভোরের মিষ্টি আঁধার কেটে হালকা আলো জেগে উঠছে। নতুন দিনের আবাহনে পাইনের বন ধরাচূড়ো ছেড়ে ফেলেছে। সবুজের ঘর-গেরস্থালীতে কখনও রোদ্দুর কখনও মেঘের মতো আরাম-আশ্রয়ের পলেস্তারা। ওরা অনেক আগেই উঠে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা উজিয়ে ওরা উঠে এল বক্সা পাহাড়ে। পথে ফেলে রেখে এল সবুজের সঙ্গে আলাপ আর পাহাড়ি মুগ্ধতা।

বক্সা পাহাড়ের সিঙ্কুলা রেঞ্জে সেখানে ডুকপা জনজাতির বাস, সেখানে পৌঁছনোর নির্দিষ্ট কোনও রাস্তা নেই। পাহাড়ি ঢাল এবং মাঝে মাঝে কিছু রাস্তার মতো জায়গা দিয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বক্সা পাহাড়। এই পাহাড়েই রয়েছে ডুকপা জনজাতিদের ছোট-বড় মোট তেরোটি গ্রাম। জনসংখ্যা কম করে হলেও পাঁচ হাজার। সেখানে নেই কোনও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলেও তেমন কিছুই নেই। করোনার মতো মহামারী যদি থাবা বসায় এই গ্রামগুলিতে, কী হবে সেই ভেবেই আতঙ্কিত ডুকপা সমাজ। সেখানে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও গড়ে ওঠেনি ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। সেখানে করোনার মতো মহামারী হানা দিলে নিমেষেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে শতাব্দীপ্রাচীন এই গ্রামগুলি।

ওরা থমকে দাঁড়াল। একটা চোখ। একটা হাত। আর রয়েছে একটা পা। ইনিই হলেন কালী মাই। বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত বিপদের রক্ষাকর্তা। এই কালী মাইয়ের শক্তির কাছে নাকি বাগ মানে দুষ্টু করোনা ভাইরাসও। এমনই বিশ্বাস বক্সা পাহাড়ের ওপরে বসবাসকারী ডুকপাদের। আর সেই বিশ্বাসেই ভুটান লাগোয়া বক্সা পাহাড়ের ওপর সিঙ্কুলা রেঞ্জে তাদের গ্রামে কালী মাইয়ের আরাধনা। এ পুজো খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। সেই ব্যয় কোথা থেকে আসছে, তা অবশ্য জানে তুর্কি। স্থানীয় এক ডুকপার কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, অভিজিৎবাবু কোথায়? সজাগ দৃষ্টিতে তাকাল তরুণটি, আপনি চেনেন তাঁকে?

উনিই তো এই পুজোর সব খরচ দিচ্ছেন, জানি।

কে আপনি? ওনার কথা আমাদের কেন জিজ্ঞেস করছেন?

আমি কলকাতা থেকে আসছি। অভিজিৎবাবু চেনেন আমায়। উনি তো কালই এসেছেন গ্রামে।

তা হলে উনি কোথায় আছেন, সেটাও আপনার ভাল জানা উচিত। আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন?

কী রে তুর্কি, কী এত কথা বলছিস ওদের সঙ্গে? পলাশ পাশে এসে জিজ্ঞেস করে।

ওই এমনি, ওদের গ্রামের কথা, পুজোর রীতির কথা জানছিলাম।

তুর্কির কথা শুনে চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে ফের ওর দিকে তাকাল তরুণটি।

ছেলেটির নাম জানতে চাইল পলাশ।

আমার নাম ফুল।

ফুল কারও নাম হয় নাকি!

মা বলেছে, আমার দাদার নামও ফুলের নামে। সে অনেক ছোটবেলায় হারিয়ে গেছে। তারপর আমার জন্মের পর ফুল নাম রেখেছে।

আর তোমার বাবা? তিনি নেই?

বাবা আর দাদা তো হারিয়ে গেছে। মা আর আমি থাকি। ওই ওদিকে আমাদের একটা দোকান আছে। আমি আর মা চালাই।

বাবা বা দাদাকে খোঁজোনি কোনওদিন?

হুঁ, মা আর আমি অনেক খুঁজেছি। ডুয়ার্সের সব জায়গায় গেছি। কিন্তু কোথাও পাইনি।

কথা বলতে বলতে ছেলেটির গলায় সরু কাটা একটা দাগ দেখতে পেল পলাশ। ওটা কী করে হয়েছে?

গলায় একটা আঙুল চালিয়ে ফুল বলল, গুলির দাগ।

মানে?

রঙ্গিনীকে ওরা মারতে গিয়েছিল। আমি বাধা দিয়েছিলাম। তখনই গুলি চালায়।

কে রঙ্গিনী? কারা মারতে গিয়েছিল?

একটা লেপার্ডের বাচ্চা। আমায় খুব ভালবাসে। ওরা মাকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। রঙ্গিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা গুলি চালায়। কিন্তু রঙ্গিনীর কিচ্ছু হতে দিইনি আমি। গুলি আমার গলা ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তরুণটির কথা শুনছে তুর্কি আর পলাশ। ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তুর্ণা আর পুষ্পালিতা। ওরাও শুনল ফুলের কথা। ওকে কেমন যেন ভালো লাগতে থাকে পলাশের। হঠাৎ তাড়া লাগায় তুর্কি, চল চল।

দাঁড়া না একটু। তোর শুনতে ভাল লাগছে না?

ফুলের কাছে কালী মাইয়ের কথা শুনতে থাকে ওরা। আমি একটু আসছি, তোরা দাঁড়া। বলে কিছুটা এগিয়ে গেল তুর্কি।

দাঁড়া, আমিও যাব। তুর্ণাও এগোল।

পলাশ ফুলকে বলে, কালী-মাই-এর পুজো করলে সত্যি সত্যি কি করোনা ভাইরাস পালিয়ে যায়?

তা জানি না, তবে বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে কালী মাই একজন পরিত্রাতা। আর সেই বিশ্বাসেই আমাদের ডুকপা সমাজের আস্থা আছে। কালী মাইয়ের আশীর্বাদ আছে বলেই উপসর্গ বেশি বাড়াবাড়ি করতে পারেনি। অনেকের প্রবল সর্দি-জ্বর হয়েছে, কিন্তু সে সুস্থ হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি, আসলে করোনা ভাইরাস শরীরে ঢুকলেও কালী মাইয়ের আশীর্বাদে তা সর্দির আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। এই ভাইরাস যতই শক্তিশালী হোক, কালী মাই আমাদের ঠিক রক্ষা করবেন।

কেমন পুজো হয়? পুষ্পালির উৎসুক মন ফের জেগে উঠল।

ফুল বলল, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে পুতুল দিয়ে এই পুজোর আয়োজন হয়। পুজো শেষে এই ছেলে পুতুলটাকে শ্মশানের দক্ষিণ পাশে আর মেয়ে পুতুলটাকে শ্মশানের উত্তর পাশে ফেলে দেওয়া হয়।

ভ্রুকুপাদের বিশ্বাস, করোনার মতো মহামারী শুধু এই ছেলে পুতুল আর মেয়ে পুতুল দুটির ওপরেই তার প্রভাব ফেলতে পারবে। আমাদের সমাজের কোনও মানুষের ওপর করোনার কোনও প্রভাব পড়বে না।

ফুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওরা একটু এগিয়ে যায়। একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। এক ভদ্রমহিলা দোকানের ভেতর টুকটাক কী যেন করছেন। ছেলের ডাকে মুখ তুলে তাকালেন। এক ঝলক দেখে কেমন যেন লাগল পলাশের। অনুভূতিটা ঠিক কেমন, তা হয়ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না।

একটু দাঁড়ান, বলে ভেতরে চলে গেল ফুল। তারপর দুটো ভাঁড়ে চা নিয়ে এল। খান, ভেড়ার দুধের চা। ঠিক তখনই তুর্কি আর তুর্ণাও এসে পড়ল।

ফুল, শুধু এই দাদা-দিদিমণিকেই চা খাওয়াবে? আমাদের খাওয়াবে না?

কিছুটা যেন বিরক্তিভরেই আরও দুভাঁড় চা নিয়ে এল ফুল। কেন যে এই লোকটিকে ফুলের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, কে জানে! অভিজিৎবাবুকে ইনি চিনলেন কী করে? তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক? অভিজিৎবাবু তো ভাল লোক না। প্রায় সাত বছর আগের একটি রাতের ঘটনা ফের ফুলকে নাড়িয়ে দিল। ওর মনে এখনও সেই ঘা বেশ দগদগে।

রাতে ফুলকে ধরেই ওদের ঘরের পাশে আরেকটা ঘরে থাকার জায়গা ঠিক করল তুর্কি। পলাশকে অবশ্য বেশ ভাল লেগেছে ফুলের। মাকে বলে পলাশ আর পুষ্পালিকে নিজেদের ঘরেই রাতে থাকতে বলল ফুল। তুর্কি আর তুর্ণার জন্য তার এক বন্ধুর ঘরে একটু দূরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

বরফ পাথরের ওপর রাত ঘন হতে বেশি সময় নিল না। ঠিক তখনই কয়েকটা ছায়ামূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে এল ফুলের বাড়ি লক্ষ করে। একটা ঘরে পলাশ আর পুষ্পালি, অন্য ঘরে ফুল আর তার মা শুয়েছে। পুষ্পালিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বলশালী এক যুবক। পলাশকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনল আরেক যুবক। তার আগে দুজনকেই নাকে রুমাল চেপে বেহুঁশ করে দিয়েছে ওরা। বাইরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ ঘোষাল। তার পাশে তুর্কি আর তুর্ণা। তুর্কি মাঝে মাঝে তুর্ণাকে মজা করে বলে, জানিস, ওই অভিজিৎবাবু একেবারে হারামির হাতবাক্স। সেই অভিজিৎবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়েই

বন্ধু পলাশ আর পুষ্পালির ক্ষতি করতে তাদের বিন্দুমাত্র বুক কাঁপছে না। তুর্কির হাতে একটা খাম এগিয়ে দিল অভিজিৎ ঘোষাল।

মালটা দারুণ, ভাই। কলকাতায় যেদিন তোমাদের সঙ্গে ওকে প্রথম দেখি, সেদিনই ঠিক করে নিয়েছিলাম, এ মাল আমার চাই। অভিজিৎ ঘোষালের মুখ দিয়ে যেন লালা ঝরছে। পুষ্পালিকে ততক্ষণে তুলে ফেলা হয়েছে একটা জিপে।

এই মালটাকে এখানেই খালাস করে দিয়ে যাব। বলে ইশারা করতেই পলাশকে টেনে খাদের ধারে নিয়ে গেল ষণ্ডামার্কা দুই যুবক। একজনের হাতে চকচক করে উঠল ছুরি। ঠিক তখনই দিগবিদিক কাঁপিয়ে হুঙ্কারের সঙ্গে জ্বলে উঠল দুটো চোখ। বল্লমের ফলার মতো সাঁ করে ধেয়ে এল একটি প্রাণী। ছুরি-হাতে যুবকের কাঁধ কামড়ে ফালা করে দিল। তারপর আরেকজনের। বিপদ বুঝে পালাতে গিয়েও পারল না অভিজিৎ ঘোষাল।

রঙ্গিনী, শেষ করে দে ওকে। ফুলের তীক্ষ্ণ গলা পেল তুর্কি। লেপার্ডটা তীরবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল অভিজিতের ওপর। গলার নলি কামড়ে ছিঁড়ে দিল। ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ফুলের মা। তুর্কি ছুটে এসে ভদ্রমহিলার পায়ে পড়ল। প্লিজ, বাঁচান আমাদের।

রঙ্গিনী তখন অনেকটাই শান্ত। ফুলের কাছে এসে আদর খাচ্ছে।

ফুল, তোর দাদা কই?

মা, আমার দাদা, কোথায় সে?

একটু একটু করে হুঁশ ফিরছে পলাশের। এতক্ষণের কাণ্ডকারখানা দেখে জিপ ফেলে পালিয়েছে ড্রাইভারও। জিপের ভেতর পুষ্পালির হুঁশও ফিরে এসেছে। ফুল ছুটে গিয়ে পলাশকে তুলে নিয়ে এল খাদের ধার থেকে। পুষ্পালিকেও নামিয়ে আনল জিপ থেকে।

দুপুরে একঝলক দেখেই চিনতে পেরেছি।

মা, তখনই বললে না কেন আমায়?

এর মাঝে সুযোগ বুঝে পালাতে গেল তুর্কি। তখনই চিৎকার করে উঠল ফুল, দাঁড়ান। একটুও নড়বেন না। না হলে অভিজিৎবাবুর মতো আপনারও অবস্থা হবে।

ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে। অপরাধীর মতো মুখ করে বসে আছে তুর্কি, পাশে তুর্ণা। ফুল বলে ওঠে, অভিজিৎবাবুর মতো দুনম্বরী কাঠ ব্যবসায়ীর সঙ্গে আপনার কীসের সম্পর্ক? শুনেছি, মেয়েপাচারের সঙ্গেও যুক্ত লোকটা। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা। তাই কিচ্ছু হয়নি। এই গ্রামের পুজোয় টাকা দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে রাখে। কিন্তু সাত বছর আগের সেই রাতের কথা ভুলিনি। মাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল ওই হারামিটা। আমার বাবার কাঠের ব্যবসার সঙ্গে পেরে উঠছিল না দেখে আমাদের সর্বস্বান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। হঠাৎই একদিন হারিয়ে যায় বাবা আর দাদা।

ফুল, তোর বাবা যে বেঁচে আছে, সেটা জানতাম। কোনওদিন তোকে কিছু বলিনি। প্রতি মাসে একটা লোক এসে আমার হাতে টাকা দিয়ে যেত। সেই টাকা তোর বাবা পাঠাত। তোর বাবা সেই লোকটার হাতে চিঠি লিখে পাঠাত, ঠিক সময়ে আমাদের কাছে আসবে।

কী, চুপ কেন, মুখ খুলুন। অভিজিৎ ঘোষালের মতো নোংরা লোকের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? তুর্কিকে বেশ কড়া গলায় বলে ওঠে ফুল।

তুর্কি কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে থাকে, কয়েক বছর আগে ডুমার্সে এসে অভিজিৎবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। কথায় কথায় পলাশ আর পবন ছেত্রীর কথা ওঠে। অনেক কথা হয়। পবন ছেত্রীর কাঠের বিশাল ব্যবসাকে যে করেই হোক শেষ করতে হবে। পলাশকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেটা আমার কাছে খুবই সহজ ছিল। পলাশ আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। এর মধ্যে একদিন কলকাতায় গিয়ে আমার অফিসে দেখা করে অভিজিৎ বাবু। সেদিনই পলাশ, পুষ্পালিকে দেখে। তারপর সব বুঝিয়ে বলে দেয়। প্ল্যানমাফিক কাজ করে দিতে পারলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সব কিছু ঠিকই এগোচ্ছিল। কিন্তু রঙ্গিনী সব ভেস্তে দিল।

তুর্কিকে থামিয়ে দিয়ে ফুল বলে ওঠে, কেন জানেন? আপনাদের মতো মানুষেরা বন্ধুর মুখোশ পরে থাকতে পারেন। কিন্তু রঙ্গিনী সেটা পারে না। ও যখন খুব ছোট, তখন চোরাশিকারিরা ওর মাকে মেরে ফেলে। বন্ধ চা বাগানের ভেতর ওকে আমি প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছিলাম। ও মনে রেখেছে। আজীবন মনে রাখবে। ও জানে, ওর প্রকৃত বন্ধু কে। সাত বছর আগে আমার মাকে বাঁচিয়েছিল, আজ দাদাকে বাঁচাল।

ফুল থামতেই পলাশ উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল, ভাই। মা, বাবাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেই বলত, ঠিক সময়ে জানতে পারবি। চল্, তোমাদের আর এখানে থাকতে হবে না। আমার সঙ্গে তোমরা কলকাতা চল্।

না রে, আমি সব জানি। তোর বাবা টাকার সঙ্গে প্রতি মাসে চিঠি লিখে পাঠাত। তোর বাবা খুব শিগগির এখানে আসবে।

কই, আমি ভুয়ার্স আসছি শুনেও তো কিছু বলেনি!

গত মাসের চিঠিতে আমায় জানিয়েছিল।

হঠাৎ পলাশের পা জড়িয়ে ধরল তুর্কি। আমাদের ক্ষমা করে দে, প্লিজ। তোরা তো আমাদের বন্ধু, বল? পলাশ আর পুষ্পালি মুখ ঘুরিয়ে নিল। পুষ্পালি বলে উঠল, যতদিন বাঁচবি, ওই মুখে বন্ধু শব্দটা আর উচ্চারণ করিস না। বন্ধুত্বের অপমান হবে।

পাহাড়ের কোলে মিষ্টি রোদ ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। বক্সা পাহাড়ের আজকের সকালটা অনেকটা আলাদা। ঠিক তখনই পুলিসের দুটো জিপ এসে থামল। পেছনে আরেকটা বড় গাড়ি। বডিগুলো তুলে নিয়ে গেল। প্রথম জিপ থেকে নেমে এল দুজন কনস্টেবল। অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল কলকাতার দুই সাংবাদিক তুর্কি ব্যানার্জি এবং তুণা নন্দীকে। দ্বিতীয় জিপ থেকে নেমে এলেন এক সুদর্শন, কর্মঠ, শক্তপোক্ত পাহাড়ি মানুষ। পবন ছেত্রী। পূর্ব ভারতের অন্যতম সফল কাঠ ব্যবসায়ী। সঙ্গে ডিআইজি রেঞ্জ, উত্তরবঙ্গ অরিন ঘোষ।

পবনকে দেখেই দৌড়ে গেল পলাশ, বাবা, তুমি আসবে বলোনি কেন? দীর্ঘদিন পরিবারের অন্তরালে থাকা মানুষটা দুই ছেলে আর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন। দূরে টিলার ওপর লেজ নাড়িয়ে মৃদু গর্জন করে উঠল ফুলের বন্ধু। পাইনের বনে ফের হিল্লোল উঠল। গাছের মাথায় খিলখিলিয়ে উঠল একফালি সূর্য।

***

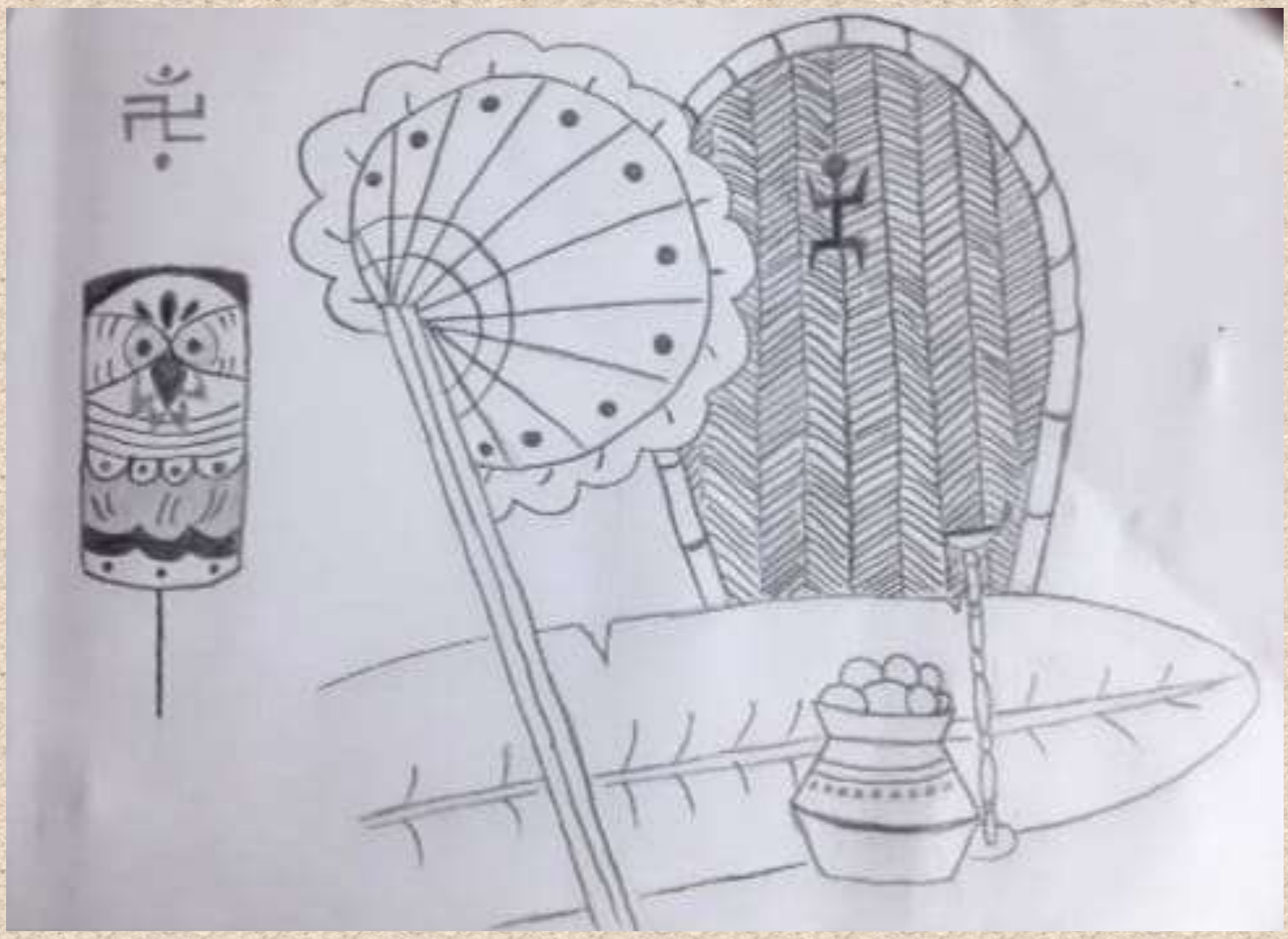

চিত্রশিল্পীঃ ঋষি ঘোষ

সাহিত্য সভায় ও সেবায় আম বাঙালির চালচলন

দীপঙ্কর বিশ্বাস

গৃহিণীদিগের মধ্যে যাহারা একটু আধটু কলম ধরিতে শিখিয়াছিলেন তাহারাও তাহাদের নিজনিজ ইচ্ছে ও খুশির কথা কিছু কিছু লিখিবেন ও লিখিয়া চলিবেন ইহাই স্বাভাবিক। যিনি ঘোড়ার গাড়ি চালাইয়া সংসার চালাইয়া যাইতেছেন, তাহার থেকে বেশি কেহ গাছগাছালি ও ঘাস দেখে নাই,তাই তাহার নিকট স্বাভাবিক হইতেছে গাছ ও ঘাস এবং তাহাতে উৎপন্ন ছোট ছোট নানাবিধ রঙের ফুল লইয়া মনের নানান প্রকার ভাবনার উদ্রেক হইলে তিনিও কখনো তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন আগে কখনো ভাবেন নাই বা ভাবনা থাকিলেও তাহা লিপিবদ্ধ করিবার কোন সুযোগ পান নাই! একদা তিনি মন্ত্রী হন হইয়া পড়িলে গড়ের মাঠে মুখে গামছা মেলিয়া চিৎ হইয়া কেবলই ঘুমাইতেন; এখন তিনি তাহাদের কথা ফেসবুকে নিজ আঙুলে টিপিয়া টিপিয়া মনের মাধুরী মিশাইয়া লিখিতেছেন। আমি একদিন দেখিয়াছিলাম মাথায় বাঁশের ঢাউস টুপি চড়াইয়া কিছু পুরুষ মুনিষ নানা কথায় সুর বাঁধিয়া অপূর্ব সুরে দেহতত্ত্ব গান গাহিতেছেন; এক হাঁটু সমতল কাদায় সারিবদ্ধ হইয়া হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া লাগাতার ধানের চারা সারিসারি করিয়া আলগোছে অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায় তড়িৎ গতিতে পুঁতিয়া যাইতেছেন। ইহাতে আমি কিছুই অবাক হই নাই;চড়চড়ে রোদে এমন গান তাহাদের মুখে শুনিয়া বড় হইয়াছি,তাহাদের সৃষ্টিশীলতা বা সৃজনশীলতা লইয়া আমার কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, তাহারা যে গান বাঁধিবে ও বাঁধিতে পারে ইহাই স্বাভাবিক! যদিও সরকারি অর্থানুকূল্যে চলা বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘ দিন বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ সকল আবকাশ ফেলিয়া মহাভারত লিখিয়া ফেলিতেছেন এমন নহে। এখন অবশ্যই সাহিত্যিক ও কবির মানত্য মূলক অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনার অবতরণ করা প্রয়োজন হইল; ইহা আত্মপ্রচারের অনুষ্ঠান কেহ কেহ বলিয়া থাকিলেও আমি তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত প্রকাশ করিতেছি না।

"লিটিল ম্যাগাজিন" হইতেছে সাহিত্য প্রচার ও প্রকাশের আতুরশালা। সে বিষয়ে পরে একদিন না হয় বিশদে আমার জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ্যে আনিয়া ফেলিব ও আলোচনা করিব কিন্তু সকল সাহিত্য গোষ্ঠী পত্রিকা করেন না একথা আপনাদের নিকট জানাইয়া গেলাম। যাহারা পত্রিকা করিতেছেন তাহার পেছনে অনেক অনেক গোষ্ঠীর সৎ ও অসৎ উদ্দেশ্য থাকিবে না এ সমাজে আশা করাও অন্যায় হইবে, তবুও বছরে সাত বার ঘটা করিয়া বিখ্যাত হল ঘর ভাড়া লইয়া সাড়ম্বরে সাহিত্যের অনুষ্ঠান চলিতেছে এবং মাসিক সভাও চলিল ছোট্ট ঘরে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিতা ও গল্প পাঠ। এ চিত্র বোধহয় সকলেই কমবেশি দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু, ঘরোয়া মাসিক কবিতা পাঠর অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের গায়ে বিশেষ কোন আঁচড় লাগিল না, যাহাতে সে কালিমালিপ্ত হইবে।তাই সে বিষয়ে না আলোক পাত করিয়া বরং ঢাউস করিয়া রঙ বেলুন ও রঙিন ফুলের মোড়কে সাজাইয়া ভাড়া লওয়া কক্ষে কবিতা ও সাহিত্যের আলোচনায় মন দিই।

কিছু ক্ষেত্রে বুঝিয়াছি যাহারা আয়োজক তাহারা কবি সাহিত্যিকদের নিত্য পূজার ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিয়া লন। আমরা কাহারো দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বা কেহ কেহ সরাসরি আমন্ত্রিত হইয়া সে সকল অনুষ্ঠানে হাজির হই। আমাদের কাজও পূর্ব নির্ধারিত নিয়মের মধ্যে পালিত হইতে বাধ্য। হাজির হইয়া মন্ত্র পাঠর মতো একখানি কবিতা পড়িয়া দক্ষিণা স্বরূপ একখন্ড কাঠর স্মারক হইয়া চলিয়া আসাই আমাদের কাজ। যদি কেহ চোখের পাতা না খোঁয়াইয়া অনুষ্ঠানে গিয়া থাকেন তবে তিনি আরো কিছুকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানে বসিয়া দন্ত উজাড় করিয়া হাততালি সহযোগে পাশে বসা বন্ধু বান্ধবী কবির সহিত গুজব কবিবেন আর ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভিন্ন ভঙ্গিতে সেলফি বা নিজস্বী তুলিয়া যাইবেন কিন্তু সে পাড়ায় বসবাস ও সহবাস করিতে মোটামুটি দুইশত টাকার কম চাঁদা দিলে আপনাকে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিলেও পূজা করিতে দিবেন না, পূজারী ব্রাহ্মণের সহিত কবি সাহিত্যিকদের তুলনা করিলে ইহাতেই খানিক ফারাক বুঝিতে পারি।

***

মেলবন্ধন

পল্লবী সান্যাল

বছর তিনেক আগের কথা। কলেজের ডিগ্রি কোর্স কমপ্লিট করে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্সে ভর্তি হয় স্নেহা। স্বপ্ন নিজের একটা বুটিকের। লক্ষ্য পূরণের জন্য সেই মতোই নিজেকে প্রস্তুত করছিল সে। ফ্যাশন ক্লাসে নেহা তার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিল। যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে স্নেহা। ক্লাসের বাকিরা তাদের বন্ধুত্ব দেখে বলত, নেহা আর স্নেহা, ভালোই হয়েছে জুটিটা। ডিগ্রি কোর্সের শেষে স্নেহা তার স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেও স্বপ্নটা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় তার মনে। সে এও জানে যদি সবটা পন্ড হয় তার জন্য দায়ী থাকবে সে নিজেই, আর কেউ নয়।

ইনস্টিটিউট ভর্তি হওয়ার বছরে নেহার সূত্র ধরে সুরেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল স্নেহার। নেহার বার্থডে পার্টিতেই দুজন দুজনকে দেখে প্রথম। আর প্রথম দেখাতেই স্নেহার মিষ্টি স্বভাব নজর কাড়ে সুরেশের। স্নেহার পুরো নাম স্নেহা সেন। বাড়ি উত্তর কলকাতায়। বাবা সরকারি চাকুরে। অন্যদিকে, সুরেশের পুরো নাম সুরেশ আগরওয়াল। কলকাতায় কেরিয়ারের জন্য থাকলেও আদি বাড়ি রাজস্থানে। স্নেহার মতো সুরেশও নেহার খুব ভালো বন্ধু। আসলে সুরেশ নেহার তুতো ভাই। নেহা আগরওয়ালও রাজস্থানে বড় হয়েছে। তারপর বাবার চাকরি সূত্রে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে ওঠা।

সুরেশের সেই দিনের ভালোলাগা ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়েছে। সুরেশকে মন দিয়েছে স্নেহাও। দুজনের সম্পর্ক আরও গাঢ় হতে লাগল। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? স্নেহা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সমাজে তার বাবার একটা সম্মান রয়েছে। আর সমাজ যে তাদের মেলামেশা ভালো চোখে দেখবে না তা সে খুব ভালো করেই জানে। তাই সে ঠিক করল বাড়িতে সবটা জানিয়ে দেবে।

অফিসের কাজে দুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়েছেন স্নেহর বাবা, শশীভূষণবাবু। এই সুযোগ মা কে একা পাওয়ার। 'মাকে আগে বলি তারপর মা না হয় বাবাকে বুঝিয়ে বলবে।' মনে মনে এমনই ভাবল স্নেহ। মাকে সবটা খুলে বলে স্নেহর মনটা হাল্কা হলেও চাপে পড়লেন স্নেহর মা চন্দ্রাণীদেবী। একেই সুরেশরা আগরওয়াল। তার ওপর এত দিন ধরে মেয়ে প্রেম করছে শুনলে মেয়েকে আর আস্ত রাখবে না, ভাবেন চন্দ্রাণী দেবী। কথাটা না জানালেও নয়, মেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে। শশীভূষণবাবু ফিরতেই তাকে সব বলে দেন চন্দ্রাণী । রেগে ফায়ার না হলেও বিষয়টি যে ভালোভাবে নেননি তা প্রকাশ পাচ্ছে তার আচরণে। এখন আর স্নেহকে এটা দে ওটা দে বলে ব্যতিব্যস্ত করেন না। কেমন যেন দূরে দূরে থাকেন। কথাও বলেন না সেরকম। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। শেষে নেহাকে জরুরী তলব করা হল স্নেহর বাড়িতে। সঙ্গে সুরেশকেও।

দিন কয়েক পরে এল সেই দিন। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা। মেস বাড়ির ডোর বেলটা বেজে উঠল। স্নেহ অবশ্য আগে থেকেই জানত যে ওরা আসবে। নেহা আর সুরেশকে সে আগে থেকেই বলে রেখেছিল শর্ট ড্রেস ছেঁড়া জিন্স না পরে শাড়ি আর পাজামা পাঞ্জাবি পরতে। কারণ সাজগোজে বাঙালিয়ানা থাকলে চন্দ্রাণীদেবীর মন সহজেই জয় করা যাবে।

আর মা ম্যানেজ হয়ে গেলে বাবার মত পেতে কতক্ষণ!

বেলের টিং টং আওয়াজ শুনে দোতলা থেকে নেমে এলেন স্নেহর মা। দরজা খুলতেই দেখলেন শাড়ি পরা একটা মেয়ে আর পাজামা পাঞ্জাবি পরা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেহা বলে উঠল আন্টি আমি নেহা, স্নেহর বন্ধু। এই শুনে চন্দ্রাণীদেবী বলে উঠলেন,এ নিশ্চয় সুরেশ। ভেতরে এস।

অনেকদিন পর বসার ঘরটা আবার গমগম করে উঠল। শশীভূষণবাবু কতক্ষণ আর বাড়িতে থাকেন। স্নেহও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। লোকজনও তেমন আসে না বাড়িতে।

নেহা : আন্টি আঙ্কেলকে দেখছি না! আর স্নেহও তো নেই।

এটাও স্নেহারই শিখিয়ে দেওয়া। স্নেহা এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে সে সবসময় নেহা সুরেশের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত।

চন্দ্রাণীদেবী : আঙ্কেলের ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। এসে যাবে এক্ষুনি। তারপরই না হয়..

বলতে বলতেই আবারো বেজে উঠল ডোর বেলটা।

শশীভূষণবাবুর বাড়ি ফেরার টাইম সন্ধ্যা ৭ টা। এক একদিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে দেরি করলেও, নেহা সুরেশের আসার কথা আছে বলে আড্ডা বাতিল করতে হয়েছে। চন্দ্রাণীদেবী উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। যেতে যেতে বললেন, 'ওই তোমাদের আঙ্কেল এলেন।' দরজা খুলতেই দেখতে পেলেন শশীভূষণবাবুর দু হাতে দুটো ব্যাগ। 'তার মানে সবকিছু ঠিকঠাকই এনেছে।' মনে মনে বলেন চন্দ্রাণীদেবী।

শশীভূষণবাবু : ব্যাগগুলো রাখো দেখি। একদম গরম গরম আছে।

বন্ধুরা বাড়িতে আসছে। তাদের তো আর খালি মুখে বিদায় দেওয়া যায় না তাই আগে থেকে স্নেহা মাকে বলে রেখেছিল কিছু স্ন্যাকসের ব্যবস্থা রাখতে। কিন্তু দোকানে কে যাবে? ভয়ে ভয়ে শশীভূষণবাবুকেই তাই বলেছিলেন।

শশীভূষণবাবু বাড়ির ভেতর পা রাখতেই স্নেহা পরিচয় করিয়ে দিল নেহা আর সুরেশের সঙ্গে। দুজনে তো উঠে গিয়ে আঙ্কেল বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আর তাতেই কিছুটা বরফ চলেছে বলে মনে করলেন চন্দ্রাণীদেবী। শশীভূষণবাবু যে তাদের এই সংস্কৃতি দেখে খুশি হয়েছেন তা আর বুঝতে বাকি নেই কারও। শশীভূষণবাবু বললেন, 'আমি চেঞ্জ করে, ফ্রেস হয়ে আসছি ওপর থেকে। তোমরা ততক্ষণ না হয় আন্টির সঙ্গে কথা বলো একটু। আর হ্যা, তোমাদের জন্য গরম গরম কাটলেট এনেছি। খাও। আসছি।'

মিনিট ২০ পর ওপর থেকে নেমে এলেন শশীভূষণবাবু। সিঙ্গেল চেয়ার টায় গা এলিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন তিনি। সুরেশকে বললেন, দেখো বাবা কথা না বাড়িয়ে আসল কথায় আসি এবার।

তোমাদের কেন ডাকা হয়েছে তা তোমরা জানো। তুমি আর আমার মেয়ে দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। তোমরা তোমাদের পছন্দ করছো, আমরা না হয় সবটা জানি। কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তারা এই বিয়েটা মেনে নেবে তো? আর যদি দ্বিমত থাকে তাহলে তোমরাও আর এগিও না। শ্বশুর বাড়ির লোক মেনে না নিলে স্নেহার পক্ষে তা কতটা কষ্টকর হতে পারে তোমার কোনো আইডিয়া আছে? সুরেশ মাথা নিচু করে শশীভূষণবাবুর সব কথা শোনে। বলে, 'আমার বাড়িতেও সবাই সবটা জানে। আসলে নেহাই বলেছে।' শশীভূষণবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন বাড়ির লোকের মত আছে কিনা। শত হলেও তিনি মেয়ের বাবা। আর এটা তার মেয়ের সারাজীবনের ব্যাপার। নেহা তখন বলে, আপনি একদম চিন্তা করবেন না আঙ্কেল। সুরেশ বলে ওঠে, আমি যে এখানে এসেছি, সেকথা বাবা মা জানে। আপনার মনে হলে আমি বাড়িতে ফোন করছি, কথা বলে নিন। দুই বাড়ির মধ্যে কথা হওয়া জরুরি। এই বলে বাবার নম্বরে ভিডিও কল করল সুরেশ। তারপর স্নেহার পরিবারের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়। স্নেহার বাবা - মা একটু অবাক হলেন, মনে মনে বললেন, স্নেহার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিল না! স্নেহা বিষয়টি ধরতে পারে। সে বলে যে আঙ্কেল আন্টি আমায় চেনে। মাঝে মধ্যেই কথা হয় ওনাদের সঙ্গে। ওনারা তো আমার স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নিয়েই নিয়েছেন। শশীভূষণবাবুর খারাপ লাগে এই ভেবে যে এত কিছু হয়ে গেল তারা কিছুই টের পেলেন না। মেয়ের কথা ভেবে এ নিয়ে আর কথা না বাড়ালেও বিষয়টা মেনে নিতে পারেন না তিনি। তবে, সুরেশের বাবা মা আলাদা কাস্ট আপত্তি করেনি ভেবে খানিক স্বস্তি পেয়েছেন।

সেদিন থেকে দুই বাড়ির মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা হতেই থাকে। এদিকে পাত্র আর পাত্রী কেউই অপেক্ষা করতে নারাজ। পঞ্জিকা দেখে ঠিক হল বিয়ের তারিখ। বছর দুই হল বিয়ে হয়েছে সুরেশ আর স্নেহার। বিয়ের পর রাজস্থানে কয়েক মাস পরিবারের সঙ্গে কাটালেও এখন পাকাপাকি ভাবে কলকাতায়। এছাড়া আর উপায় কী! স্নেহা তার বুটিকের তারজোর করছে, আর সুরেশও ভালো কোম্পানিতে জব করে। প্রতিষ্ঠিত। বিয়ের আগে থেকেই স্নেহার বুটিকের স্বপ্নটাকে নিজের স্বপ্ন বলে ভাবতে শুরু করেছিল সুরেশ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে সেই স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। সুরেশ ও স্নেহার তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১ বৈশাখের শুভ লগ্নেই স্থির হয়েছে বুটিকের উদ্বোধন। প্রেমিকা থেকে স্ত্রী হয়ে ওঠা স্নেহার পরিচয় এখন থেকে ফ্যাশন কনসালটেন্টও।

পয়লা বৈশাখ

মৌরী খাতুন

ফোনটা বেজে যাচ্ছে। বর্ণালী তখন ইনহেলারের জন্য জল গরম করছিল। জল ফুটে এসেছিল একদিকে। অন্যদিকে প্রাণতোষ টানা ডেকে যাচ্ছে।কোনও ডাকে সাড়া না দিয়ে,কেটলির নল দিয়ে বাষ্প বেরবে কখন তার অপেক্ষা করছে বর্ণালী এক মনে।কেটলির হাতল ধরার নীল সাদা চৌখুপি কাটা কাপড়টা খুঁজছে বর্ণালীর চোখ। ভাতের ফ্যান ঝরিয়ে যন্ত্রের মতো কেটলি থেকে গরম জল ঢেলে ইনহেলারটা নিয়ে ঘরে ঢুকলো বর্ণালী।প্রাণতোষকে বলল স্টিম নিয়ে নাও।

------নিচ্ছি তুমি থাকো এখানে।

দু মিনিট থেকে বিছানার চাদরটা টানটান করে দিল বর্ণালী, কুঁচকে গিয়েছিল।কোঁচানো চাদর বিরক্ত করে,বারবার। জানলার পাল্লাটা খুলে পর্দাটা একটু টেনে দিল।রোদ সরে গেছে। টুকটাক কাজে ভুলে গেল, ও তো ওকে থাকতে বলেছিল ওর কাছে।খালি জলের বোতলটা নিয়ে বর্ণালী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রান্নাঘরের দিকে যাবে কি ফের বেজে উঠল ফোনটা।

দায়সারাভাবে রিসিভারটা তুলে কানে দিল,হ্যালো।

নিরাসক্ত একটা হ্যালো।অপরপ্রান্ত চুপ। বিরক্তগলায় আবার হ্যালো, এই শেষ বার এরপরও অপরপ্রান্ত কথা না বললে রেখে দেবে ফোনটা।আর তখনই নিজের নাম শুনতে পাচ্ছে বর্ণালী।আটপৌরে নামটা।

------বলছি একটু থাকে অপরপ্রান্ত বলে,আপনার বইটা পড়লাম। বর্ণালী কিছু বুঝতে পারে না ভাবতে শুরু করে রং নাম্বারে ফোন। এবার বইয়ের নামটা বলে।তোমার সাড়া পেয়ে খুশি হয়েছে ও।বর্ণালীর ও ভালো লাগছে কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।অপরপ্রান্ত এবার জানতে চায় বর্ণালীর

কথা।আলাপ করতে চায়। বর্ণালী এড়িয়ে যায়। সে বলে, মাঝে মাঝে এমন ফোন করবো কিন্তু আপনাকে।বর্ণালীর ভালো লাগে সে কথা শুনে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষ তাকে আদরকরে ফোন করবে শুনে কেন যে তার ভালো লাগে বোঝার চেষ্টা করে বর্ণালী।ফোন রেখে দেবার পর সেই ভালোলাগাটুকু নিয়ে প্রাণতোষের ঘরে যায়।ও শুয়ে আছে।আড়াআড়ি চোখের ওপর হাতটা রেখে। চোখ বোজা।বুঝতে চেষ্টা করছে বর্ণালী কেন ভালো লাগে,ও হঠাৎ বলে কে ফোন করেছিল এখন?বর্ণালী থমকে গিয়ে বলে ও তুমি চেনো না। আমার পরিচিত। খবর নিচ্ছিল তোমার। মিথ্যে কেন বললো নিজেও জানে না।

----সকালগুলো কোনও নতুন খবর আনে না তার জন্য। একটা চাকা যেন ঘুরে চলছে। থেমে-থেমে।হোঁচট খেতে খেতে। চাকাটা কিন্তু এগোচ্ছে না। স্থির। পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে এক একদিন। বাবা প্রাণতোষের আফিসের কর্মচারী হবার দরুন মাঝে মাঝেই দৃষ্টি বিনিময় হয়েই থাকতো আর প্রাণতোষ তার মাতৃহারা ১১ বছরের ছেলে শুভর জন্য একজন ভালো মা ওরফে আয়া খুঁজছিলেন, ঠিক সে সময়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বিমল বোসের সুন্দরী ৩০ উর্দ্ধ কাজকর্মে নিপুন মেয়েটিকে বাড়ির বউ হিসেবে না হলেও কিছুটা সন্তানের দেখাশোনার জন্য নির্বাচনের সুযোগ পেলেন। অসুস্থ বিমলবাবু মা মরা বিয়ের বয়স পেরোনো মেয়েটির সুযোগ্য পাত্র হিসেবে প্রাণতোষকে পেয়ে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। নিজের থেকে ১৬ বছরের বড় প্রাণতোষকে স্বামী বলে মেনে নিতেও কিছু মাত্র আপত্তি করেনি বর্ণালী।স্বপ্ন দেখে সংসার করবার, মা হবার, মা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।কারণ বিয়ের পর বর্ণালীকে বলা প্রাণতোষের প্রথম কথাটি ছিল, সে কখনো মা হতে পারবেনা।বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল সেদিন।প্রাণতোষ চায় না তার জীবনে শুভ ছাড়া অন্য কোন সন্তান আসুক।তার এই শর্তটি অনেক আগেই তার বাবাকে জানানো হয়েছে। সব শুনে কেমন যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে বর্ণালী। জন্মদাতা পিতাও যে কোনদিন তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাটুকু এভাবে কেড়ে নিতে পারে তা ভেবে স্তম্ভিত হয়েছিল সে।

----সবকিছু মেনে নিয়ে,সকাল থেকে দৌড়,চা,জলখাবার,বাজার রান্নার তদারকি,কাজ করতে করতে শরীরটা বিশ্রাম চাইত।রোদ, জল,অসুস্থতা যাই থেকে একটুও বিশ্রাম পেত না।এতো ব্যস্ততার মধ্যেও মাথায় আসতো এক একটা লাইন। খাতা পেন নিয়ে বসার জন্য মন ছটফট করতো।মনের মধ্যে ঝাপটা মারত শব্দরা।ও অফিসে বেরিয়ে গেলেই, নিজের স্নান খাওয়ার সংক্ষিপ্ত করে নিত।তারপর দুপুর এলেই সমস্ত দিনের সব ক্লান্তি হারিয়ে যেত।মাথা থেকে লাইনগুলো সাজিয়ে নিত খাতায়।কত রাত ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে শব্দরা। সকলে ঘুমোচ্ছে, বর্ণনা নিঃসাড়ে উঠে খাতার পাতায় টুকরো কাগজে সাজিয়ে দিয়েছে শব্দগুলোকে।ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। জল খেতে উঠছে ও, দেখেছে আমাকে টর্চ জ্বালিয়ে লিখতে।তীব্র বিদ্রুপে আহত করেছে ও।রাগে দিশেহারা হয়ে লেখা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়েছি কত রাত।ঘুমহীন। আমার নির্ঘুম রাত আমার কোনও দায়িত্বকে অবহেলা করেনি।সময়ে চা, খাবার, স্নানের জল সব সাজিয়ে দিয়েছি ওদের জন্য।কবিতা, খাতার পাতায় আমার শব্দবিস্তার কোনও সাংসারিক কাজের সুরাহা করে না। ভালোলাগা ব্যতীত আর কোনও মূল্য নেই যে কাজের তা ওকে করতে হবে লুকিয়ে।চুরি করার মতো।চুরি করার মতোই খামে ভরে কবিতা ইস্ত্রিওয়ালাকে কাপড় দিতে যাবার সময় লুকিয়ে পোস্ট অফিসে গিয়ে পাঠিয়েছি কবিতা দপ্তরে।পাঠিয়েছি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি তা প্রকাশ হতে পারে।প্রকাশ হলেই ধরা পড়ে যাবে চুরি। ধরা পড়েও গেল।গায়ে হাত তোলাটাই শুধু বাকি ছিল।গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দেওয়ার মতো কথাগুলো জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল গায়ে সেদিন।ভদ্র পোশাকের আড়ালে এতদিনের চেনা মানুষটার ভিতরটা দেখে কুঁকড়ে গিয়েছিল বর্ণনা। আড়াইশো টাকার চেকটা পড়ে থেকে থেকে মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না কোনও।ও ভাবতেই পারত না ওর নামে অ্যাকাউন্ট খোলার কথা।অন্যায়, অপমানে কেমন বেপরোয়া হয়ে একের পর এক কবিতা,গল্প লিখেছে বর্ণনা। পাঠিয়েছে এখানে ওখানে। প্রকাশ হয়েছে। যতবার ওর লেখা বেরিয়েছে ততবারই ওইরকম অপমান।গায়ে সহ্য নিয়েছিল। ও রাগে পাগলের মতো হয়ে যেত।রাগে কথা বন্ধ রেখেছে প্রাণতোষ দিনের পর দিন।বর্ণনাও দিনের পর দিন না খেয়ে সব কাজ করে গেছে।

----ডাক্তার বলেছিলেন আপনারা বুঝতে পারেননি। এ রোগের সূত্রপাত হয়ে গেছে বহুদিন। শুভকে বলেছিলাম মাঝেমাঝে বাবা যেন বড্ড বেশি চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। নিজের চাকরি, নিজের সংসার নিয়ে

ব্যস্ত শুভ গা করেনি বর্ণালীর কথায়।বয়সটাকেই কারণ বলেছে।বেরোনো-টেরোনো কমে গেছে ওর।বর্ণালীই জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার,ভরসা দেননি। ওর ওষুধ, খাওয়া, স্নান এর বাইরে আজ আর কিছু নেই বর্ণালীর।একটা ফোন শুধু অন্যরকম ছিল।

ওকে ওষুধ খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আলমারি খুলে নিজের বইটা বার করে বর্ণালী।কতদিন পর মনে পড়লো বইটার কথা।অথচ এই বই একদিন তার কাছে সন্তানের মতো প্রিয় ছিল।পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে।মাঝেমাঝে ফুটা করেছে পোকায়।জানলার পাশে ছোট চৌকিটাতে বইটা রেখে পেন আর কাগজ খোঁজে বর্ণালী।পেন আর কাগজ তো পেয়ে যায়,কিন্তু একটা শব্দও মাথায় আসছে না। বছরের পর বছর যাদের কথা একবারও মনে পড়েনি, কলম হাতে নিলেই তারা ছুটে আসবে? তবুও হতাশ না হয়ে সমস্ত দুপুর ধরে ওদের ডাকলো আর খুঁজে বেড়ালো বর্ণালী।

------আচ্ছা তোমার কি কোনও বন্ধু নেই? আপনি বিরক্ত হন ফোন করলে? বর্ণালী কথা খুঁজে পাই না।প্রায় অচেনা এই গলার স্বরের কাছে কী স্বীকারোক্তি করবে? এই ফোনই তো বদলে দিয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছে আবার। আরও যেন কে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিস্মৃতির অতল থেকে।সাদাপাতার সামনে আবার বসতে ইচ্ছে করছে।

-----আমি বুঝতে পারি আপনি বিরক্ত হন। দয়াপরবশ হয়েই ছাড়েন না ফোন টা।কবিরা তো খুব দয়ালু হয়,আমি জানি সে কথা। জানেন,মনে করি আর ফোন করবো না।সাতদিন, খুব বেশি হলে দশ দিন---- আবার আপনার নম্বর কল করে ফেলি।ছোট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি পয়লা বৈশাখে। আপনাকে আসতেই হবে।আপনার "কুঞ্জকুটির" কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাবেন ঐ দিন।এখন একটু আবৃত্তি করে শোনান না প্লিজ।বর্ণালী আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখলো ওর গলা বন্ধ হয়ে আসছে। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বই দেখে দেখে পড়ে যায় লাইনগুলো। তারপর চোখ বুজে যায়। লাইনগুলো মাথায় ঠিকঠাক সাজানো হয়ে যায়।চোখ বুজে আবৃত্তি করে যায় বর্ণালী। তীব্র কটুগন্ধে ঘোর কেটে যায় বর্ণালীর। অপরপ্রান্তকে বিদায় না জানিয়েই ফোনটা নামিয়ে রেখে দৌড়ে যায় রান্নাঘরে।গ্যাসের ওপর বসানো প্যানটা ঝলসে গেছে। ধোঁয়ায় রান্নাঘর ভরে গেছে। তরকারিটা পুড়ে ছাই। বর্ণালীর চোখে জল এসে যায়।তার

মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় আবৃত্তি না করলে মার কাছে কত বকুনিই না খেতে হয়েছে। কত ভালো আবৃত্তিই না করতো সে।এখনো বাপের বাড়ির ভাঙা শোকেসটা ঘাটলে ছোট বেলায় পাওয়া শিল্ড বা মেডেলগুলো হয়তো মিলবে।ভাবতে ভাবতে দুচোখ গড়িয়ে জল ঠোঁটের কোনে এসে পড়লে সম্বিত ফেরে ওর কাশির আওয়াজে।এক গ্লাস জল নিয়ে ছুটে বর্ণালী।ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে প্রাণতোষ ওর দিকে।কাশির দমকে ওর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। ছলছলে।পাখার স্পিড বাড়িয়ে জানলার পাল্লাগুলো হট করে খুলে দেয় বর্ণালী। ওকে জল দিয়ে জিজ্ঞেস করে খিচুড়ি খাবে? পোড়া বাসন জলে ভিজিয়ে ফের খিচুড়ি রান্নার তোড়জোড় শুরু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে রান্নাঘরে। ভুলে যায় অনুষ্ঠানের কথা।এমনকি ভুলে যায় হলুদ হয়ে যাওয়া বইটার কথা।দুটো ঝকঝকে থালায় খিচুড়ি আর আলুসেদ্ধ পরিবেশন করে বর্ণালী। গরম ধোঁয়ায় চশমার কাঁচ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়।ভুলেই যায় আজই বুধবার "পয়লা বৈশাখ"।আজই অনুষ্ঠানে ছিল তার নিমন্ত্রণ। ফোন বাজছে।এখুনি বলতে হবে তার অপারগতা। বেজে যাচ্ছে ফোন-----।বর্ণালী ইনহেলারের জন্য জল গরম করছে একমনে।অপেক্ষা করছে কেটলির নল দিয়ে বাষ্প নির্গমনের।ও ডেকে যাচ্ছে, জানি সাড়া দিয়ে লাভ নেই, ডাকা বন্ধ হবে না।শুধু চোখ দুটো খুঁজে চলেছে লাল সবুজ চৌখুপি কাটা কাপড়খানা। গরম কেটলির হাতলটা ধরার অভিপ্রায়ে।

***

মেলা

কিশোর ঘোষ

মেলা বসেছে, যেখানে শীত ফেলেছে তার সার্কাস তাবু, যেখানে আমরা বিক্রি হই এবং হব গরম গরম জিলিপি পাঁপড়ে। হয়তো এক জন্মে তুমি ভঙ্গুর কাঁচের চুড়ি, নরম মেয়েরা হাতে পরীক্ষা করবে, পছন্দ না হলে সুখ খুলে রাখবে। এবং নাগরদোলায় ঘোরে বন বন... হাসা ও হাসির তারা, মায়া ঘূর্ণির ভিড়, সৌজন্যে মেলা। আরও আরও, পুতুলের, ভেলকির নাচ, মরণকূপের খেলা। আহা ফুচকা-জীবন, জীবন ঘুঘনি, টক-ঝাল চালতা আচার! ওই কার ওড়না ওড়ে.., হঠাৎ স্বাধীন পাখির ডানায়। আর দুষ্টু ছেলেরা খুব ঠেলা দেয়, দুষ্টু মেয়েরা সেই ঠেলা খায়। অথবা তুমি ফাটালে তোমার বন্দুক, বিষণ্ন বেলুন! তবে দেখে শুনে কিনো, সংসারে সবই যোগাড়, সকল প্রয়োজন--- মুখ ও মুখোশ, কুড়ুল কোদাল, হাতা-খুন্তি-হাঁড়ি। ভুলে যেও না যেন চারা ফুলগাছ, ইঁদুর মারার বিষ বিস্কুটও।

মেলা বসেছে, যেখানে শীত ফেলেছে তার সার্কাস তাবু। দেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে..শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মর্ত্যপ্রেমের ভারসাম্য লীল!

তোমার জন্মদিনে

নার্গিস সুলতানা

সাদামাটা চারপাশটা রঙিন হবে, এবার সব বদলে যাবে।

গোটা একটা শহর হবে আজ থেকে তোমার নামে। তুমি আজ আসবে বলে কথা দিয়েছো যারা জানে না তাদের বিশ্বাস ভেঙে যাবে তোমাকে সামনে দেখে। তোমার সাথে সাধারণ সেলফি ও দারুণ মনে হবে, আর অনেক অনেক প্ল্যান হবে। সেলিব্রেশনও মাতবে - আর তোমার সাথে সাজবে সবাই ভালোবাসার জন্মদিনে।

বই কুটির কলকাতা

: পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যা :

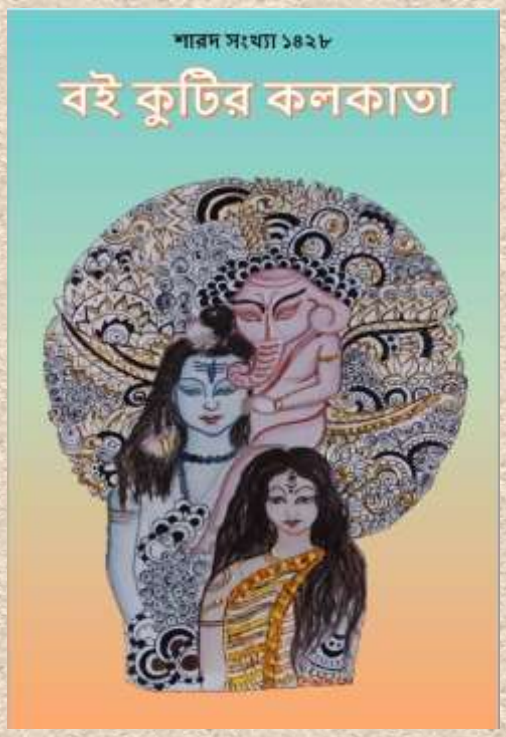

শারদীয়া ১৪২৮

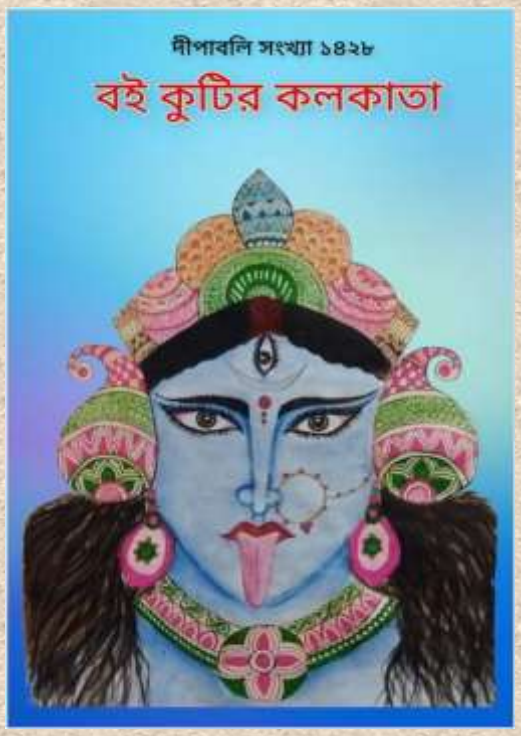

দীপাবলি ১৪২৮

শীতকালীন ছোটদের সংখ্যা ১৪২৮

সরস্বতী সংখ্যা ১৪২৮

বই কুটির কলকাতা

বই কুটির

কলকাতা

শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন

+91-9903129991

boikutirkolkata@gmail.com

https://www.facebook.com/Boi-kutir-kolkata-বই-কুটির-কলকাতা-123508622632570/

https://www.boikutirkolkata.co.in

https://www.instagram.com/Boi_Kutir_Kolkata/